# বিবেকবাণী

( প্রথম লহরী )

বিবিধ-প্রবন্ধ।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"If an offence come out of the Truth, better is it that the offence come, than the Truth be concealed."—*Jerome.*

"* * * Such truths are necessarily given to the consciousness by Divine aid, they are written on the soul of man by that hand which writes no falsehood."

—*Frances Power Cobbe.*

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

---

কার্ত্তিক—১৩১০।

মূল্য ৸৹।

# সূচী

# উৎসর্গ।

---

পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ

উদারচরিতেষু।

দ্বারিক বাবু,

আপনি বিজ্ঞ, আপনি পণ্ডিত। কিন্তু আমার নিকট সে জন্য আপনি পরিচিত নহেন। আপনি উদারচরিত ধার্ম্মিক, আপনি হৃদয়বান মানব-হিতৈষী, এইজন্য এ দীন, হৃদয়ের নিভৃত স্থানে, আপনাকে পূজা করিয়া থাকে। পৃথিবীতে ঘুরিয়া দেখিয়াছি—প্রকৃত হৃদয়বান লোক পাওয়া বড়ই কষ্টকর। স্বার্থময় পৃথিবীতে, স্বার্থের জীবন্ত ছবি, সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। মানব-সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া, অতি অল্প লোকেরই চক্ষের জল পতিত হয়। একের দুঃখে অন্যের দুঃখ, একের অশ্রুতে অন্যের অশ্রুপাত, এ অহং-জ্ঞানময় সংসারে, প্রায়ই হয় না। অনেক স্থলে যাহা না পাইয়া প্রতারিত হইয়াছি, আপনার মধ্যে তাহা পাইয়াছি। সেই জন্যই আপনাকে ভক্তি করি, সেই জন্যই আপনাকে ভালবাসি।

আর আপনাকে ভালবাসি, এই জন্য,—আপনার সহিত এ হৃদয়ের অনেক ভাবের যোগ আছে। ভাব-বিনিময়ের জন্য জগৎ লালায়িত; আমিও লালায়িত। বন্ধু-দুর্ঘট সংসার-মরুতে, আপনার হৃদয়ের সুস্নিগ্ধ মিষ্ট ভাবে, আমার হৃদয় মন অনেক সময়ে শীতল হইয়াছে। দেখিয়াছি—ভাবে ভাবে আপনাতে আমাতে এক নূতন যোগ। সে কথা পৃথিবীর কোন লোক জানে না, কোন লোক জানিবে না।

এক ভাবের যোগে, আমার জিনিস আপনার প্রিয়, আপনার জিনিস আমার প্রিয়। ভাবের যোগে,—আমার কথা, আপনার কথা; আপনার কথা, আমার কথা। কথায় কথার মিলন, ভাবে ভাবের মিলন;—স্বাধীনতায়,—অধীনতা; স্বাতন্ত্র্যে,—একতা; বিভিন্নতাতে,—চির-মিলন।

মিলনের কথা বলিতে আপনার নিকট আজ এ দীন উপস্থিত। আমার বিবেকের কতকগুলি কথাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এ সকল কথা, সঙ্কীর্ণ

সাম্প্রদায়িক ভাব-প্লাবিত বঙ্গে, অন্য কোথাও আদৃত হইয়া আশ্রয় পাইবে, আমার সে আশা নাই। আমার এ সকল কাহিনী, ইংরাজ-নিন্দা-প্লাবিত দেশে পঠিত হইবে, আমার সে বিশ্বাস নাই। সমদুঃখী, সমদুঃখীর কথা শুনিতে ভালবাসে, বলিয়াই, আমার কাহিনী আপনাকে শুনাইতে আসিয়াছি। আপনার নিকট আমার কথা মিষ্ট লাগিবে, জানিয়াই, আপনার নামে আমার বিবেক-বাণীকে উৎসর্গ করিলাম। আপনি ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেই, আমি কৃতার্থ হইব। আশা করি, আপনি ইহাকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দান করিবেন।

আনন্দ-আশ্রম, কলিকাতা।
মাঘ—১২৯১।

আপনার স্নেহ-প্রার্থী—
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

# বিবেক-বাণী

## ( প্রথম লহরী )

### আবাহন।

বিবেক,

তুই আমার কাছে আয়। স্বর্গের পরী—আকাশের চাঁদ—চাঁদের আলো—মন্দার কুসুম,—কুসুমের বাস—উষার স্নিগ্ধ কিরণ, তুই আয়, আমার পরাণে তোর অমিয়-সুধা ঢালিবি, আয়। তোরই তরে এ পরাণি তৃষিত, উৎকণ্ঠিত। তোর নাচুনি, তোর হাসুনি, তোর মধুর সম্ভাষণের জন্য এ হৃদয় উৎকণ্ঠিত! পাপ সংসারে কেবলই কণ্টক-শয্যা—কেবলই কর্কশ রব। চতুর্দ্দিকে কেবলই প্রলোভন,—কেবলই আকর্ষণ। কোন্ দিকে যাইব, কাহার কথা শুনিব, কিছুই ভাবিয়া ঠিক পাই না। সকলেই আপন আপন পথে আমাকে টানিতেছে—চন্দ্র সূর্য্য, লতা বৃক্ষ, বন উপবন, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, নর নারী, সকলেই আমাকে স্বীয় স্বীয় ক্রোড়ে পূরিতে চাহিতেছে। কোন্ পথে যাইব, কাহার কথা মানিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রশংসার মৃদু মধুর গীতি, নিন্দার কর্কশ কষাঘাত আমাকে মহাগোলে ফেলিতেছে, বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মহাগোল নহে—এ মহা আঁধার! এ মহা আঁধারে পড়িয়া আমি কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট—সুতরাং মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছি। এ আঁধারে আর সহায় সম্বল নাই—কেহ ভাল কথা বলে না, কেহ বিশেষত্বের পথ দেখায় না। পৃথিবীতে যাহা আছে, তাহারই প্রতি-রূপ হইতে সকলে পরামর্শ দেয়! আমার জীবনের বিশেষত্বের পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না, তুই আমার কাছে আয়! দুঃখীর ধন, তুই আমার প্রাণে আয়! তুই আমার দর্শন, তুই আমার বিজ্ঞান, তুই আমার বিদ্যা, তুই আমার বুদ্ধি। এই দুর্দ্দিনে তোকে পাইলে আমি কৃতার্থ হই। তোর কথা স্বর্গের দুর্ল্লভ পদার্থ—ঐ কথা মানিয়া যখনই চলিয়াছি, তখনই কত সুখ,

কত শান্তি পাইয়াছি। তোর কথা শুনিয়া যখনই পা ফেলিয়াছি, তখনই স্বর্গের এক সিড়ি উপরে যেন উঠিয়েছি! তোর দিকে যখন চাহিয়াছি, তখন দুর্ব্বল কীটাণু হইয়াও বীরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। তোর কথা মতে যখন চলিয়াছি—তখন সংসারের সকল সুখ-ঐশ্বর্য্য—মায়া-মোহ ছিন্ন করিয়াও এক অতুল আনন্দ-স্রোতে ভাসিয়াছি। সে আনন্দ সদানন্দ—চিদ্ঘন আনন্দ! সেই আনন্দের প্রস্রবণ তুই! আনন্দময়ীর আনন্দ-শিশু, সদানন্দ বেশে এই নিরাশা দুঃখ পরিতাপের দিনে,—এই অবিশ্বাস নাস্তিকতার দিনে—এই জড়পূজার দিনে—এই মহা আঁধারের দিনে তুই আমার ভিতরে আয়, তুই আমার বাহিরে আয়! আনন্দময়ীর আনন্দবার্ত্তা আনন্দে আনন্দ লহরী তুলিয়া আমাকে তাহাতে নিমগ্ন করিতে আয়! স্বর্গের পরী, স্বর্গ ছাড়িয়া আয়! মন্দার কুসুম স্বর্গ ছেড়ে এই নরকে আয়! তোর সুবাসে আমাকে মাতাইয়া দে! আনন্দময়ীর আনন্দ-শিশু, নিরানন্দকে ডুবাইতে তুই আয়! মঙ্গলময়ীর মঙ্গল-শিশু, সকল অমঙ্গলকে নাশিতে তুই আয়! অভয়ার অভয়-শিশু, আমাকে নির্ভয় করিতে আয়! অভেদানন্দময়ীর আশা-শিশু, ভেদাভেদ নাশিতে তুই আয়—যশ ও নিন্দাকে সমান করিতে আয়। দুঃখীর প্রাণে সুরশিশু আয়! স্বর্গের সুবাস লইয়া আমাকে মাতাইতে আয়। তোকেই রাখিব, তোরই কথা মতে চলিব—তোরই পথে হাটিব! তোকে ধরিলেই মাকে পাইব—তোকে পূজিলেই বিশেষত্বের পথ পাইব। আনন্দময়ীর আনন্দশিশু, তোকে ধরিলেই আনন্দময়ীর পূজা অর্চ্চনার প্রণালী পাইব। তোর বাণী তোরই থাকিবে, তোর জিনিস তোর নামেই বিকাইবে। তোর প্রাণ তোর নামের জোরেই ভবনদী পার হইবে! তোর জিনিস স্বর্গের জিনিস—নরকের কোন জিনিসের সহিত তাহাকে মিলাইব না। তোর জিনিস তোরই থাক্—তোর জিনিস তুইই রাখ্! তোর জিনিস তুইই ধর—তোর জিনিস তুইই নে! নিয়া যাহা করিতে হয়, কর। আমি এ ভার বহিব না, এ ভার রাখিব না। তোর জিনিস তুই নে, আমার জিনিস তুই হ। তুই আমার প্রাণের দেবতা হ, তুই আমার গৃহ-দেবতা হ,—তুই আমার সর্ব্বস্ব হ! তোর কথা শুনি, আর সর্ব্ব-মঙ্গলাকে দেখি, তোর কথামতে চলি, আর আনন্দময়ীর আনন্দ-রূপসাগরে ডুবি। আমার জীবনের আশা, তুই আমার সর্ব্বস্ব হ।



# বাহির না ভিতর ?

সকল প্রকার ধর্ম্মসাধকদিগের মধ্যে প্রায়ই দুই শ্রেণীর লোক পরিদৃষ্ট হয় ;—এক শ্রেণীর লোক বলেন, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলকে যাঁহারা দমন করিতে পারেন, তাঁহারাই চরিত্রবান লোক। ব্যভিচারী হইয়া পরস্ত্রীর প্রতি কুটিল নয়নে তাকাইব না, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীর কোন প্রকার অপকার করিব না, অন্যের প্রতি হিংসা করিব না, অন্যের উন্নতিতে কাতর হইব না, পরনিন্দা করিব না, মিথ্যা কথা বলিব না, পরের অনিষ্ট করিব না, এবম্প্রকার নীতিবাক্য এই শ্রেণীর লোকদিগের চরিত্র-ভূষণ। এই শ্রেণীর সাধকগণ কঠোর ধর্ম্মনীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া সময়ে সময়ে এমন কদর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন যে, সে সকল বিষয় ভাবিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠে! এই শ্রেণীর লোক রিপু দমন করিতে অসমর্থ হইলে কখনও বা লিঙ্গোৎ-পাটন করেন, কখনও বা চক্ষু উৎপাটন করেন, কখনও হস্তপদকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন—কখনও বা সংসারকে, সমাজকে সাধনার ঘোরতর বিরোধী কল্পনা করিয়া চিরদিনের তরে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ সংসার-বিরাগী। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন—তাঁহারা কেবল ইহা করিব না, উহা করিব না বলিয়া নিরস্ত থাকেন না ; বলেন,—ব্যভিচারী হইব না, পৃথিবীর অপকার করিব না. মিথ্যা কথা বলিব না, ইত্যাদি প্রকার না-সংযুক্ত কথা লইয়া থাকা মৃত ধর্ম্মোপাসকের কর্ম্ম—ঐ সকল নীতি নীতিই নহে। ইঁহারা বলেন, কুটিল নয়নে তাকাইবার পরিবর্ত্তে ভালবাসার চক্ষে দেখিব, ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্ষমা করিব—কোল পাতিয়া দিব, অন্যের অনিষ্টের পরিবর্ত্তে উপকার করিব, পরনিন্দার বদলে পরমহত্ত্ব স্মরণ করিব, মিথ্যার পরি-বর্ত্তে সত্য কথা বলিব। এই শ্রেণীর লোক সংসারকে সাধনার বিরোধী মনে করেন না, বরং তৎপরিবর্ত্তে ইহাই বলেন, সংসারের সকল বস্তুই মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট, সুতরাং তাহার কোন কিছু পরিত্যাগ করা মহাপাপ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণী প্রকৃত পক্ষে চরিত্রবান, তাহার

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, চরিত্র কি, তাহা বিচার করা যাউক। চরিত্র কি প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি 'না'র সমষ্টি, না আর কিছু? যাহাতে দোষ নাই, সেই চরিত্রবান, না যাহাতে গুণ আছে; সেই চরিত্রবান? আমাদের মত এই, চরিত্রে এই দুই থাকা চাই। চরিত্রের অর্থে আমরা সংক্ষেপে এই বুঝি, যাহা মানুষের হওয়া উচিত, বা করা উচিত—আদর্শ। মনুষ্যের আদর্শ নির্ণয় করা যায় কি প্রকারে? বিবেকের দ্বারা। বিবেক কি,—ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি,—বিশ্বাসীর মতে ঈশ্বরের আদেশ বা বাণী। এই বিবেক যাহা মনুষ্যকে করিতে নিষেধ করে, তাহা না করা, এবং বিবেক যাহা করিতে বলে, তাহা করাই মানবের কর্ত্তব্য বা মানবের আদর্শ। বিবেকই রাজা, বিবেকই চরিত্রের মূল শক্তি। কিন্তু এই বিবেকের উপরেও মনুষ্যের ইচ্ছা-প্রতিষ্ঠিত রাজা আছে, সে বিবেচনা শক্তি। বিবেচনা শক্তিকে রাজত্ব দিলে বিবেক মলিন হইয়া যায়, সুতরাং তখন বিবেকও কুপথে মানুষকে চালাইতে পারে। এইরূপ অবস্থা হইলেই মানুষ বিষকে সুধা বলিয়া গ্রহণ করে, যাহা পশুত্ব তাহাকেই মনুষ্যত্ব বলিয়া আদর করে, যাহা অকর্ত্তব্য তাহাকেই কর্ত্তব্যজ্ঞানে পূজা করে। এই জন্যই দেখা যায়, মানবসমাজের অনেকেই বিবেকের অধিকারী হইয়াও নানা প্রকার বিপরীত পথে চলিতেছে,—এক জনের কর্ত্তব্য অপরের ঘৃণার জিনিস হইতেছে, কার্য্যের-উপাসক মানবমণ্ডলী পরস্পরের প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়া বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত করিয়া পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে। এই জন্য চিরকাল পৃথিবীর লোক ভাই ভাই কাটাকাটী করিয়া মরিয়াছে।

বিবেকের রাজা ঈশ্বর, স্বাধীন ঈশ্বর-বায়ু সেবন ভিন্ন বিবেকের পরিপুষ্টি অসম্ভব। ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানব কখনও ঈশ্বরের চরণশৃঙ্খল হইতে বিবেককে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন মস্তিষ্কে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না;—আপন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বিবেচনা-শক্তির অধীনত্বে বিবেককে আনয়ন করেন না। তাঁহারা মনে করেন, সকল জ্ঞান, সকল বিজ্ঞান চূর্ণ হইয়া গেলেও বিবেককে কোন বৃত্তির অধীনে আনিব না। এই প্রকার লোকের নিকট বিবেক কখনও ভুল কথা বলে না। আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রভুত্ব ডুবাইয়া যাঁহারা ঈশ্বরদাস বিবেকের আদেশানুসারে চলেন, তাঁহারা কখনও কুচরিত্রে উপনীত হইতে পারেন না। আলোকের নিকট আঁধার থাকা যেরূপ অসম্ভব, বিবেকের নিকট কুচরিত্র থাকাও তেমনি অসম্ভব। মলিনতা ও পাপ-তাপ-পূর্ণ নরকের পথ

যে বিবেক দেখাইয়া দেয়, সে বিবেক মৃত বিবেক, মনুষ্যের স্বার্থ ও স্বেচ্ছাধীন বিবেক, সে বিবেক মানুষের গোলাম। কি পরিতাপের বিষয়, পৃথিবীর কত কোটী কোটী নরনারী এই পবিত্র জ্যোতির্ম্ময়ী বিবেক আপন বিবেচনা বা ভাবের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, অধীনতা স্বীকার করাইয়া, আপনাদের পরিণাম ঘোরান্ধকারে ডুবাইয়া দিতেছেন। বিবেক—আলো, জ্যোতি পবিত্রতা, পুণ্য, শান্তি, সদানন্দ, অমৃত—স্বর্গ। ইহাতে আঁধার নাই, নিরানন্দ নাই, কলঙ্ক নাই, অশান্তি নাই, বিষ নাই—নরক নাই। এই বিবেক মানুষকে যে পথে চালায়, সেই পথে চলাই চরিত্র! চরিত্র আলো—পবিত্রতা, পুণ্য, শান্তি অমৃত—স্বর্গ। চরিত্রে সৎসাহস, সদানন্দ, অধ্যবসায়, বীরত্ব, সকল সার বস্তু নিহিত। চরিত্রে মানুষ দেবতা, চরিত্রহীনতায় মানুষ পশু। চরিত্র আছে, অথচ জ্যোতি নাই, পবিত্রতা নাই, সৎ সাহস নাই, অধ্যবসায় নাই, শান্তি নাই, পুণ্য নাই; ইহা অসম্ভব কথা। সেই পরিমাণে মানুষ চরিত্রবান, যে পরিমাণে মানুষে আঁধারের পরিবর্ত্তে আলোক আছে, নরকের পরিবর্ত্তে স্বর্গ আছে। নরক কি ?—স্বর্গের অভাব। আঁধার কি ? জ্যোতির অভাব। স্বর্গ না থাকিলেই নরক তাহার পরিণাম, জ্যোতি না থাকিলেই অন্ধকার পরিণাম। কিন্তু নরক বা অন্ধকারের পরিণাম স্বর্গ বা জ্যোতি নহে। নরক না থাকিলেই যে স্বর্গ থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। অন্ধকার না থাকিলেই আলোক আসিবে, এমনও কোন শাস্ত্র নাই। পুণ্য ও পবিত্রতা এক জনের মধ্যে না থাকিলে সে লোকের মধ্য পাপ কলঙ্ক আসিবে, কিন্তু পাপ কলঙ্ক এক জনের মধ্যে না থাকিলেই সে লোক পুণ্যবান ও পবিত্রাত্মা হইবে, এমন কোন কথা নাই। এইজন্য যাঁহারা পাপ হইতে বিরত, তাঁহারাই পুণ্যবান নহেন। যাঁহারা পুণ্যবান নহেন, তাঁহারা চরিত্রবান নহেন, ইহা সহজ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রথম শ্রেণীর সাধক-শ্রেণীকে প্রকৃত চরিত্রবান মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাঁহাদিগের মধ্যে দোষ না থাকিলে থাকিতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। দোষ না থাকিলে তাঁহারা পশুত্ব হইতে উঠিয়াছেন এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তাহাতে দেবত্বে উন্নীত হন নাই। দেবত্ব কিছু যোগ ভিন্ন হয় না। মানবচরিত্রে প্রেমের যোগ, পুণ্যের যোগ, সৎবস্তুর যোগ ইত্যাদি হইলেই দেবত্ব হয়। নিষ্কলঙ্ক প্রেমচন্দ্রমার সংস্পর্শ ভিন্ন মানব এ রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে না। বিবেকের দ্বারা মানবে এবং ঈশ্বরে সংস্পর্শ হয়। বিবেককে যাঁহারা মলিন করেন, তাঁহাদের জীবনে

এ প্রকার সংস্পর্শ কথনও ঘটে না; সুতরাং তাঁহারা নরকের কীট না হইলে হইতে পারেন, কিন্তু স্বর্গের দেবতা তাঁহারা নহেন। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা যেহেতু সুতরাং এবং জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া, ভাল মন্দ বিচার করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হন, তাঁহারা ক্রমেই নরকের দিকে গমন করেন; আপনারা মরেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে পূতিগন্ধময় কলঙ্কের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ; কি বা জানে; কি বা ধারণা করিতেপারে! অদ্যকার পরিণাম যে গণনা করিয়া ঠিক বলিতে পারে না, সে আবার কিসের অহঙ্কার করিবে? মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনা বিবেকের দ্বারা চালিত না হইলে তাহা কিছুই নহে, উহা ভুল, উহা মহা-ভ্রান্তি। এই জন্য যাঁহারা ইহা করিব, কারণ ইহাতে সমাজের এই অনিষ্ট, ইহা রাখিব না, কারণ ইহাতে আমার এই উন্নতির ব্যাঘাত, যাঁহারা এই প্রকার হেতুবাদের গণ্ডগোল লইয়া ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা ধর্ম্ম-জগৎ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছেন; প্রকৃত চরিত্র তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে। এই চক্ষু ঈশ্বর দিয়াছেন কি মঙ্গল অভিপ্রায়ের জন্য, আমি কি জানি, এই রিপু ও ইন্দ্রিয় সকলকে দিয়াছেন ঈশ্বর তাহার কি মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য, আমি কি জানি? তিনিই জানেন। এই সংসার, এই সমাজ তাঁহারই মঙ্গলাভিপ্রায় সংসাধনের জন্য। ইহার কিছুই পরিত্যাগ, বর্জ্জন বা রক্ষা করিবার আমার অধিকার নাই। তিনি রাখিয়াছেন, তাই রহিয়াছি; যখন রাখিবেন না, তখন এক মুহূর্ত্ত কালের জন্যও থাকিতে পারিব না। ভাল মন্দ বিচার আমি করিব? ক্ষুদ্র মানব—অহঙ্কারী, মূর্খ, বামন হইয়া স্বর্গের চন্দ্রমা স্পর্শের সাধ তোমার কথনই পূর্ণ হইবে না। অরণ্য তাঁহার, সমাজ তাঁহার, সংসার তাঁহার, আমি তাঁহার, জ্ঞান বুদ্ধি সকলই তাঁহার, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়, আমি কে যে, আমি ভাল মন্দ বিচার করিব? এই করিয়াই ডুবিয়াছি। হায়, বিবেকের আদেশ লজ্মন করিয়া বিবেচনা ও ভাবের পূজা করিয়াছি—কত ভ্রাতা ভগ্নীর হৃদয়ে শেল-বিদ্ধ করিয়াছি।;—আমি মরিয়াছি—জোর করিয়া চরিত্রকে রক্ষা করিতে চেষ্টা .করিয়া মরিয়াছি। কোথায় চরিত্র—স্বর্গের ধন, আর কোথায়, আমি, নরকের কীট। আমি সংসার ছাড়িব, সংসার রাখিব, এই অহঙ্কারে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বিবেকের আদেশ—স্পর্শ-মণিকে উল্লজ্মন করিয়া অমৃত বলিয়া বিষের সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছি।

হায়, আমার দুর্দ্দশার শেষ কোথায়! লোকে আমার নিন্দা বা চরিত্রের দোষ ঘোষণা করিতে আমি ক্রোধে অধীর হই, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য কত চেষ্টা করি—আইনের ভয় দেখাই—কত কি করি; আর আমি যে প্রকৃত পক্ষেই ভিতরে মরিয়া পচিয়া পড়িয়া রহিয়াছি, তাহা একবারও ভাবি না। কোথায় জ্যোতি, আর কোথায় আমি; কোথায় পুণ্য, প্রেম, শান্তি, আর কোথায় আমি! পাপ করি না, তাতে আমার কি, পুণ্য কোথায়? হায়, কোথায় চন্দ্রমা, আর কোথায় আঁধারে আমি? কে ধরিবে, কে তুলিবে, কে রাখিবে? সংসারে এমন কে আছে?—সাধ্য কার? সব অক্ষম—সব অক্ষম, সব অক্ষম। কে পথ দেখাবে? সব অন্ধ, সব অন্ধ। ডুবিয়াছি যে সর্ব্বনাশিনী বিবেচনা ও ভাবের আজ্ঞায়, তাহারা আজ কোথায়? অজ্ঞান মানব, ভিতরে হলাহল, বাহিরে সুধা মাখিয়া কি হইবে? নামাবলী গায়ে দিয়ে গেরুয়া-বসন পরিলে, চক্ষের জলে ভাসিলে, মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিলে, বা আইনের সাহায্যে চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে, ভিতরে কি হইয়া রহিয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ। তুমি গেরুয়া বসনই পরিধান কর, আর নামাবলীই গায়ে দেও, বা একতারার তানে খোল করতাল বাজাইয়া হরিনামই গাও, যতদিন তোমার ভিতরের সৌন্দর্য্য জগৎকে,—আমাকে আলোকিত না করিবে, তাবৎ তোমার ঐ সকলকে আমি ভণ্ডামি বলিয়া বুঝিব। ধর্ম্ম-জগতে চালাকি খাটে না—এখানে প্রতারণা চলে না। তুমি বুঝিতে পার বা নাই পার, তোমার ভিতরে কি আছে, জগৎ তাহা দেখিয়া ফেলিতেছে। বসন ভূষণের দিকে কেন তাকাইয়া আছ?—একবার ভিতরে ডোব, ভাব-রাজ্য ছাড়—ক্ষণস্থায়ী ক্রন্দনে বা উচ্ছ্বাসে তোমার জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে না। ঐ সকল বাহির লইয়া কেন মজিতেছ, আর সেই সঙ্গে সংসারকে বাহিরের অসার পদার্থে কেন আসক্ত করিবার পথ খুলিতেছ?—স্থির হও, ভিতরে জিনিস আছে কি না, পরিত্রাণের পথে যাইতেছ কি না, এই সকল স্থির মনে বসিয়া একবার ভাব। ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে কি হইবে, ভাই যদি ভিতরে মরিয়া থাক। উচ্ছ্বাসের পর অবসাদ, ক্রন্দনের পরই সুখ। পুত্রশোকে অধীর হইয়া যে মাতা কাঁদিল, তাঁহার শোক ক্ষণস্থায়ী; যে গভীর শোকে ডুবিল, তাঁহার চক্ষে জল আসিবে না,—তাঁহার হৃদয়ে তুষের আগুনের ন্যায় যে শোক জ্বলিতেছে, তাহা ক্রন্দনের অতীত—ক্রন্দনে তাহা উপশম হয়

না; তাহাতে লোককে উন্মত্ত করে। পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী মলিন মানব, ভিতরে তাকাইয়া তোমার পাপপূর্ণ হৃদয়ে যদি সেই ভাব না দেখিতে পাও, তবে নিশ্চয় তুমি প্রতারিত হইয়াছ। গভীরতম হৃদয়ের অঙ্কে প্রবেশ কর, আর অন্তরাত্মার প্রতি তাকাও, তারপর ভিতরে হুতাশন জ্বলিয়া উঠুক। আমি তোমার ঐ বাহিরের বেশে ভুলিব না। ভিতরে মরিয়া বাহির রাখিবার জন্য কেন চেষ্টা—কেন অহঙ্কার? সংসার কি চরম লক্ষ্য?—যাইতে কি হইবে না,—এই শরীর, এই সবই কি লক্ষ্য? ভুল কথা। বাহির অসার, ভিতর চাই। ভিতর থাকিলে বাহির না থাকিলেই বা কি? থাকিলেই বা কি? চক্ষু ভিতরে যাক্, বাহিরের বস্তু থাকুক আর না থাকুক, তাতে কি? ভিতরের দিকে যদি মনশ্চক্ষু যায়, তবে বাহিরের সংসার থাকিলেই বা কি? আমি এই চাই—সকল সাধন ভিতরকে লইয়া হউক। মনটাকে সংস্কৃত করাই কাজ। এ করিব না, ও করিব না, এতে আমার চরিত্র হইবে না। ভিতরে কিছু যোগ করা চাই। সংসার তখনই আমার বিরোধী, যখন আমাকে আমি সংসারে ফেলিয়া রাখি; আর যখন আমাকে টানিয়া ভিতরে লই, তখন সংসার বিরোধী হইয়া আমার কি করিবে? যে রিপুর দাস, সেই কামিনী-কাঞ্চনকে ভয় করে। আসক্তি থাকিলেই মজিতে হয়। আসক্তি না থাকিলে কামিনী-কাঞ্চন কি অনিষ্ট করিতে পারে? সকলই বিধাতার সৃষ্টি, সকলের মধ্যেই ভাল জিনিস আছে। সকলেই থাকিবে, অথচ মনে হইবে যেন কিছুই নাই। আসক্তি-শূন্য হইলে আর ভয় কি? সক্রেটীস্ মরিলেন, যিশুখ্রীষ্ট মরিলেন, তাতে তাঁহাদের কি অনিষ্ট হইল? সংসার পরিত্যাগের বাসনা ততক্ষণ, নিশ্চয় জানিবে, যতক্ষণ আমি সংসারের জীব। বসন ভূষণ পরিত্যাগের বা পরিবর্ত্তনের বাসনা ততক্ষন, যতক্ষণ আমি বসন ভূষণের দাস। পরিত্যাগ কি, রাখাই বা কি? আমি কিছুই জানি না; আমি কেবল ভিতর চাই—ভিতরে পুণ্য নাই, প্রেম চাই, ভক্তি চাই, সৎসাহস চাই,—অধ্যবসায় চাই, শান্তি চাই, পবিত্রতা চাই,—আমার মাকে চাই—পরিত্রাণ ও জীবনের আশা ভরসাকে চাই। যাহা পাইলে বিবেক পাইব, তাহাই চাই। যাহা পাইলে চরিত্র পাইব, তাহাই চাই। যাহা পাইলে আলোক পাইব, তাহাই চাই। বাহির চাই না—আর বাহির না। কেবল বাহির লইয়া থাকিলে—সংসার; বাহির ছাড়িলে তবে স্বর্গ। আমি কেবল সংসার চাই না, আমি পরিত্রাণ চাই, স্বর্গ, চাই; বাহিরে নরক, আমি

তাহা লইয়া কি করিব? সংসার যোট বাঁধিয়া আজ হইতে আমার নিন্দা রটনায় প্রবৃত্ত হও, আমার অহঙ্কারকে ডুবাইয়া দেও, তোমাদের পায়ে পড়ি, ডুবাইয়া দেও। আমার বড় সাধ, আমি একবার গৃহে প্রবেশ করিব, আমি আর বাহিরের আন্দোলন, আড়ম্বর লইয়া থাকিব না। গৃহে যাইব—বেলা গেল, আর সময় নাই—আর বাকী নাই। আমার বিবেচনা দূর হও, জ্ঞান দূর হও; বুদ্ধি দূর হও, আজি গৃহে যাইয়া মায়ের কাছে এই ভিক্ষা মাগিব, বিবেক যেন আমার রাজা হন। না হইলে আমি আর বাঁচি না—আমার বাঁচিবার আর উপায় নাই। সকলের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া একজনকে দাসখত্ লিখিয়া দিব—তিনিই প্রভু, তিনিই সব, তাঁহারই উপর নির্ভর করিব। তিনি রাখিতে চান, থাকিব, তিনি মারিতে চান, মরিব। তাঁহার বাক্য পালনেই পুণ্য, প্রেম, শান্তি, পবিত্রতা—চরিত্র। সেই বাক্যই বিবেক। তাহারই ভিখারী আমি। বিবেককে পাইলে সংসারকে কে ডরায়? বিবেকের কথা ধরিয়া চলিতে পারিলে, চরিত্রের জন্যই বা কে ভাবে?

## লক্ষ্যপথে।

বিজ্ঞান দর্শনের কত উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থানে যে একটী অমীমাংসিত জটিল প্রশ্ন ছিল,—কেন এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার পরিষ্কার উত্তর দিতে পারিল না। মাতৃঅঙ্কে ছিলাম, ভূমিষ্ঠ হইলাম; বিষম তিমিরাবৃত স্থান হইতে আসিয়া আলোকের মুখ সন্দর্শন করিলাম। ঐ আলোকের ভিতর হইতে কত ফুল, কত পল্লবে সুশোভিত হইয়া কত বৃক্ষ, কত সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া কত পক্ষী—আকাশ নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, বালক বালিকা, যুবা বৃদ্ধ, নর নারী, জ্ঞান বিজ্ঞান আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহারা যেন একযোট বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আমাকে সমাদরে, সযত্নে সংসারে রাখিয়া শিখাইবে। সেই অস্পষ্ট, অব্যক্ত, অলক্ষিত, গুপ্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইতে লাগিল, ইচ্ছা অনিচ্ছা না থাকা সত্বেও আমি থাকিলাম, বড় হইলাম, শিখিলাম। জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান আসিল, বুদ্ধি ছিল না, বুদ্ধি পাইলাম,—আঁধারে আলো ফুটিয়া উঠিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাহিরের সৌন্দর্য্য বিকাশের সহিত মন ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব্বে পৃথিবী যোট বাঁধিয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল,

কত ভালবাসার পরিচয় দিয়াছিল, ক্রমে আমিও পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিলাম, ভালবাসিলাম। মাতার চখের কোণে যে ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ খেলিতেছিল, তাহার এক বিন্দু আমার চক্ষে পড়িল। মা আমাকে দেখেন, আমি মাকে দেখি। কেন দেখি, জানি না, তবুও দেখি। মাতার ক্রোড়ে কি এক অপূর্ব্ব প্রেমের কুসুম-শয্যা ছিল, জানি না, তাহাতে শুইতে না শুইতে, বসিতে না বসিতে আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাহারই ছায়া পড়িল;—মা আমাকে সাপটিয়া ধরেন, আমিও মাকে ক্ষুদ্র বাহু দিয়া সাপটিয়া ধরি—ইচ্ছা হয় বুকের ভিতরে পূরিয়া রাখি। মাতার মুখে কি এক অপূর্ব্ব সুধার খনি ছিল, যাই আমাকে ডাকেন, অমনি আমি গলিয়া যাই—আর আমিও মাকে ডাকি। কি অপূর্ব্ব বিনিময় হইয়া গেল। শুষ্ক মৃত্তিকায় সরসী সৃজিত হইল, পৃথিবী জানিল না, বুঝিল না, কাহার ইঙ্গিতে। শিশু প্রেম-বিভূতি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মাতার ক্রোড় হইতে মৃত্তিকায় নামিয়া হামাগুড়ি দিল—মৃত্তিকাকে চুম্বন করিল, আপন পর জ্ঞান নাই, ভাল মন্দ বিচার নাই, যাহাকে পায়, তাহাকেই কোল দেয়, যাহা পায়, তাহাই ধরিয়া মুখে দেয়। মূর্খ পৃথিবী মনে করিল, বালক আহারে ব্যস্ত। বালক যে প্রেমের খেলা খেলিল, তাহা পৃথিবী বুঝিল না। পৃথিবী বলে এটা ধরো না, ওটা ছুঁয়ো না, এটা মাটী, ওটা বিষ, এটা আপন, ওটা পর। বালক অস্পষ্ট ভাষায় বলে, মাটী বুঝি না, বিষ বুঝি না, আপন পর জানি না, সকলই আমার, সকলকেই ধরিব, তারপর চুম্বন করিব—মুখের অমৃত দিয়া আমি প্রেমলীলা খেলিব। নিষেধ মানিল না, বালক যাহা পাইল, তাহাই মুখে দিতে লাগিল। বালক হাসে, খেলে, পৃথিবী বিপদ গণনা করে, বলে, বালক বিষ খাইয়া মরিল। পৃথিবী বুঝিল না যে, মায়ের কোলের ছেলে মরে না। মানুষ যখন হাত ধরিতে বালকের কাছে রহিল না, তখন বালক কত বিষ, কত মাটী, কত কি মুখে করিল, কিন্তু মৃত্যু হইল না, মৃত্যু আসিল না। বালক কি মৃত্যুর ভয় করে? তোমরা কি কখনও শুনিয়াছ, শিশু আগুনে হাত দিতে বা বিষ ধরিয়া মুখে দিতে কখনও কুণ্ঠিত হইয়াছে? পাপময় সংসারের বালক কুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার তালিকা আছে, জানি, কিন্তু পাপের অস্পৃশ্য বালক-জগতে যাও, দেখিবে সেখানে তাহাদের মনে ভয় নাই। বালক যেন জানে, সে আর মরিবে না, সে অমর। আশ্চর্য্য লীলাখেলা হইল। দর্শন বিজ্ঞান পরে প্রমাণ করিল,

বালক কিছুই বুঝেনা, সুতরাং সে সুখী নহে ; কিন্তু আমি বড় হইয়া বুঝিয়াছি, আমি তখনই সুখী ছিলাম, যখন মায়ের কোলে ছিলাম। মায়ের কোলে অবোধ সন্তান দোলে, নাচে, হাসে, গায়, সেই সুখই প্রকৃত সুখ, তাহাই জীবনের প্রিয়। এখন বড় হইয়াছি, স্বার্থপর পৃথিবী ঘেরিয়া ধরিয়াছে, এখন ঐ দোলনি, ঐ হাসি ভুলিয়া গিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ সুখের আকর্ষণ ভুলিতে পারি নাই। শিশু বালক হইল, বালক যুবা হইল, যুবক বৃদ্ধ হইতে চলিল। বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি, এখন বুঝিয়াছি,—এ শরীরের শেষ আছে—এ হাত চিরদিন কলম ধরিয়া লিখিবে না, এ চক্ষু চিরদিন পৃথিবীর শোভা দেখিবে না, এ কিছুই থাকিবে না। এ পৃথিবী আমার নিকট আঁধার হইয়া যাইবে। গৃহ মাটীতে পড়িয়া পচিবে, টাকাকড়ি, ধনজন, মান সম্ভ্রম, প্রশংসা নিন্দা, সকলি পড়িয়া থাকিবে। পৃথিবী পৃথিবীই থাকিবে, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা একদিন না থাকার ন্যায় হইবে। আমার পক্ষে এক দিন সকলই ফাকি, সকলই অসার প্রতিপন্ন হইবে। এ অসারে ক্রীড়া করিতে কেন আসিয়াছিলাম ? পৃথিবী কি মীমাংসা করিল, আজও বুঝি নাই, কিন্তু আমি এই বৃদ্ধবয়সে পদার্পণ করিয়া বুঝিয়াছি—আসিয়াছিলাম, কেবল মায়ের কোলে দুলিতে। মা আর আমি, আমি আর মা। মা'র মুখ আমি দেখিব, আর মা আমার মুখ দেখিবেন। প্রাণে প্রাণ, প্রেমে প্রেম, জ্ঞানে জ্ঞান। বুঝিয়াছি,—মায়ের প্রেম লইয়া আসিয়াছিলাম,—সংসারকে প্রেম বিলাইয়া আবার মায়ের কোলে যাইব, হাসিব, গাইব বলিয়া। পৃথিবী মায়ের ছবি, সেই ছবিতে দুলিব, নাচিব গাইব, আর মাকে দেখিব। কিন্তু যখন বড় হইলাম, তখন মাকে ভুলিলাম, মাকে দূর করিয়া দিলাম। পৃথিবী আমার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িল। অমৃত সেঁচিয়া বিষ বাহির করিলাম। বিষপানে রত হইলাম। মাতার আসক্তি সংসারকে দিলাম। বিশ্বমাতার প্রত্যক্ষ ছবি—ক্ষুদ্র মাতা অমনি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মায়ের মুখ আঁধার হইল—মাকে আর দেখিলাম না। পথ ভুলিয়া গেলাম, আর মাতার কাছে যাইতে পারিলাম না। মাতা অন্তর্হিত লইলেন। পৃথিবীর ইতিহাস ইহার সাক্ষী আছেন। আর সাক্ষী আছেন যে,—আমি মাকে ভুলিয়া সংসার আসক্তিতে ডুবিয়াছি,—ইন্দ্রিয়সুখে বিভোর, টাকা কড়ি, যশমান, সুখ ঐশ্বর্য্যে মত্ত, প্রশংসা ও স্তুতিবাদে আত্মবিস্মৃত। আমি জীবিত কি মৃত ? বিজ্ঞান বলে, জীবিত। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের চক্ষে আমি আজ দেখি-

তেছি, আমি মরিয়া রহিয়াছি। মৃত কে ?—যাহার চৈতন্য থাকে না। যাহার চৈতন্য থাকে, সে সার অসার বুঝিতে পারে। আমি তাহা পারিতেছি না,—এই অট্টালিকা, এই টাকা, এই যশ,—এই সংসার দুদিনের, তবু ইহাদের মমতা ছাড়িতে পারিতেছি না। যাইতে হইবে, তাহা ভুলিয়া রহিয়াছি! আর মৃত কে ? যে আপনি ইচ্ছামত চলিতে ফিরিতে পারে না। আমি তাহা পারি না—আমার আমিত্ব নাই,—তুমি আমায় চালাও, ঐ টাকা চালায়, ঐ যশ চালায়, ঐ সংসার চালায়। কেবল দাসত্ব, কেবল দাসত্ব, কেবল দাসত্ব। তুমি চোক রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাও, আমি অমনি বসিয়া পড়ি। তুমি যাই বল, এই কাজ কর, নচেৎ তোমার নিন্দা রটাইব, অমনি আমি উঠিয়া সেই কার্য্য করি। লোকে বলে, রাজার দাস প্রজা, আমি দেখি, দাস প্রজার দাস আমি। টাকা কড়ি, বাড়ী ঘর, যশ মান, সুখ ঐশ্বর্য্য, অহঙ্কার, কাম ক্রোধ, এই সংসারের সকলের দাস আমি;—আজি আমি মৃত। কেন আমার এ দশা হইয়াছে ? মায়ের শিশু মায়ের মুখ ভুলিয়া কি জীবিত থাকিতে পারে? মাকে ভুলিয়া আমি মরিয়াছি। মাতার স্বাধীন সন্তান, আজ আমি অধীন গোলাম,—মৃত। এদিন থাকিবে না, আবার দিন আসিতেছে। আবার লক্ষ্যপথে ধাবিত হইব, সে দিন আসিতেছে। আবার সংসারকে ভুলিব, সে দিন আসিতেছে। আবার সব ভুলিয়া মায়ের কোলে দুলিব, সে দিন আসিতেছে। আসিতেছে সংসারের মৃত্যু—মাতার সন্তানের নবজন্মতিথি। বৃদ্ধ হইতেছি, আর বুঝিতেছি,—এ সকল উপলক্ষ আর আমার নহে। সংসার, তুমি ভ্রুকুটী দেখাইয়া কি ভয় দেখাইতেছ, আমিঃ আর তোমার থাকিব না। বন্ধুবান্ধব ছলনা করিয়া, আমাকে পথ ভুলাইয়া রাখিয়াছিলে, ঐ দেখ আর রাখিতে পারিবে না—দিন আসিতেছে। তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, মা আমাকে ভোলেন নাই—ঐ দেখ আবার আসিতেছেন। কেশ পাকিতেছে—দন্ত নড়িতেছে—অঙ্গ শিথিল হইতেছে—ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইতেছে। আবার আঁধার আসিতেছে! সংসার-আসক্তি—সকল ভালবাসাকে আঁধার করিবার দিন আসিতেছে। মূর্খ মানুষ—দূর হও, তোমাকে দেখিয়া আর ভুলিব না। আয়ু ক্ষীণ, দীন যায়—রাত্রি যায়—আবার দিন আসিতেছে। কেশব বড় চতুর বালক ছিল—কিন্তু পারিল না—ঐ আঁধার তাহাকে ধরিয়াছে। আসক্তি,—অহঙ্কার, আজ তাঁহার সকলই আঁধার। কমলকুঠীর আধার—ব্রহ্মমন্দির আঁধার—বঙ্গদেশ আধার! মায়ের

সহিত চালাকি খাটিবে না। সব ভুলিয়া কেশব আজ আবার মায়ের ক্রোড়ে দুলিতেছে। কেশব লক্ষ্য ভুলিয়া অসার ধূলিতে মজিতেছিল, আজ আবার মায়ের কোল পাইয়াছে। বিজ্ঞান গর্ব্বিত নাস্তিক জগৎ—কই কেশবকে আজ ধরিলে না? কেশব কোথায় গেল? খুঁজিলে না? ভালবাসার ফাঁদ পাতিলে না?—নিন্দা করিলে না? মূর্খ জগৎ, আর কেন, অহঙ্কারকে চূর্ণ কর। মাতার বিশ্বব্যাপিনী রূপ দেখ। তিনি দিলেন, তিনিই নিলেন। সোণার মানুষ ধূলি-খেলা লইয়া থাকিবে, প্রেম-ভক্তি ভুলিয়া থাকিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। কেশব গিয়াছেন—আমিও যাইব, ভাইরে, তুমিও যাইবে। লক্ষ্য ভুলিয়া থাকিবার যো নাই। লক্ষ্য ভুলিয়া থাকিব না। প্রাণের ভিতর এই বাসনার আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, নির্ভীক বালক হইয়া মায়ের কোলে আবার দুলিব,—বাল্য-খেলা আবার খেলিব। অনন্ত প্রেম জলধির কোলে বসিয়া প্রেমদুগ্ধ পান করিব, আর হাসিব, গাইব, খেলিব। আমি অজ্ঞান, ঐ অনন্তের নিকট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কিছুই জানি না, বুঝি না, ইচ্ছা হয়, বালকের ন্যায় সকল জ্ঞান বিজ্ঞান দূরে রাখিয়া মায়ের কোলে দুলি। দুলিব যে দিন, সে দিন আসিতেছে। আমিও দুলিব, তুমিও দুলিবে—সব একাকার হইবে;—বড় ছোট, ধনী নির্ধন সব সমান হইবে। মৃত্যু আসিতেছে—তোমাকে আমাকে সকলকে বালকত্বে পরিণত করিতে—অহঙ্কার ও আসক্তিকে ডুবাইতে। লক্ষ্য এক ভিন্ন দুই নাই। যে স্বীকার করে না, তারও যে লক্ষ্য, যে স্বীকার করে, তারও সেই লক্ষ্য—ঐ বিশ্বমাতার বিশ্ববিস্তৃত কোল! লক্ষ্য কেবল—অনন্ত প্রেম পুণ্যের প্রস্রবণের নিম্নে বালক হইয়া তৃষিত নয়নে তাকাইয়া থাকা,—অনন্তের সহিত ক্ষুদ্রত্বকে মিশাইয়া দেওয়া। বড় হইয়াছি,—জ্ঞানী হইয়াছি, বিদ্বান হইয়াছি,—আমি "হেন তেন," এ চালাকি আর খাটিবে না। অনন্ত—অনন্ত—অনন্ত। অনন্ত পক্ষপুটে ক্ষুদ্রত্বকে লুকাইতেই হইবে—মাথা নত করিতেই হইবে। যত বড় হও, চিরকাল বালক, যত পাও ততই বালকত্ব বৃদ্ধি। সাধ পূরিবে না—অনন্ত পিপাসা। বালক হইতেই হইবে—অহঙ্কারকে চূর্ণ করিতেই হইবে। লীলা সাঙ্গ হইয়া আসিল—গণনা করিয়া দেখ, কিছুই হইল না—কিছুই হয় নাই। জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটে নাই, শান্তির তৃষ্ণা মিটে নাই, প্রেমের তৃষ্ণা মিটে নাই,—যে বালক সেই বালক। প্রেমময়ী বিশ্বজননী সংসার লীলা খেলা করাইলেন মানুষকে এই শিক্ষা দিতে, মানুষ

বালক হইবে। আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে—আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। মাগো, তবে আর কেন? সেই দিন আন, শিশু হইয়া তোমার ক্রোড়ে বসিয়া পড়ি। অনিমেষ নয়নে তোমাকে দেখি, আর তুমি আমাকে দেখ। তোমার চক্ষু হইতে অনন্ত প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া আমাকে প্লাবিত করুক, আর সেই প্রেমে রঞ্জিত হইয়া তোমাকে এই ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা আমি ক্ষুদ্র বুকে পূরিয়া রাখিয়া কৃতার্থ হই। তোমার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত শক্তির প্রস্রবণে ডুবাও, আমি অবোধ, অজ্ঞান, নির্ভীক বালকের ন্যায় মোহিত হইয়া, অহঙ্কার ও আসক্তিকে পরাজয় করিয়া তোমাতে মগ্ন হইয়া থাকি। তোমারই কোলে হাসিব, দুলিব, নাচিব। বিশ্বজননি, দাসের এই সাধ পূর্ণ কর। 'স্বাধীনতা' চাই না, অধীন কর। পৃথিবী তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছে, মাগো, পৃথিবীকে একবার তুমি বালক করিয়া কোলে তুলিয়া নিয়া দেলাও, নাচাও, হাসাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর।

## অনন্ত মিলনের রাজ্য।

এক দিন বসিয়া ভাবিতেছিলাম,—পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-রাজ্যের কত উন্নতি হইল,—যাহা ছিল না, তাহা আসিল, যাহা জ্ঞানের অগোচর ছিল, তাহা প্রকাশিত হইল; কিম্বা যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা পূর্ণ হইল; যাহা দোষ-সংযুক্ত ছিল, তাহা দোষমুক্ত হইল; সংক্ষেপে সহজে বলিতে হইলে বলা যায়—কত উন্নতি হইল; কিন্তু পৃথিবীর অনেক লোকের কেন আজও এই মত রহিল যে, ধর্ম্মজগতে নূতন সত্য কিছু পাওয়া যাই-তেছে না? ভাবিতেছিলাম, মানুষ এক দিন প্রকৃতির সহচর ছিল,—উলঙ্গ, অনাবৃত, অস্নাত, আমমাংসভক্ষণ-রত ছিল, আজ বেশভূষায় সুসজ্জিত, সভ্যতায় ভূষিত, জ্ঞানে অলঙ্কৃত, সুপক্ক আহারে রত। আদিম সময় হইতে মানব-ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, মানুষ কত পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে; অথবা সন্দেহ হয়, সেই মনুষ্য জাতিই এই কি না। এতই উন্নতি, এতই পরিবর্ত্তন! শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মনেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আরো হইতেছে, কালের ঢেউ যেন ক্রমেই উলটি পালটি কেবল পরিবর্ত্তনের স্রোতই প্রবাহিত করিতেছে। প্রাতে যে মানুষ দেখি, অপরাহ্ণে আর সে মানুষকে দেখিতে পাই না; রাত্রে যে

মানুষ শয়ন করে, প্রাতে আর পৃথিবীর বাজারে সে মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাল যাহা ছিলাম, আজ তাহা নই ; আজ যাহা আছি, কাল হয় ত আর তাহা থাকিব না। পরিবর্ত্তনময় জগতে কেবলই পরিবর্ত্তন, উন্নতি-পিপাসু মানবরাজ্যে কেবলই উন্নতি ; কিন্তু সত্য থাকিতেও সত্য-জগতের উন্নতি কেন হইতেছে না, অথবা কেন সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত রহিল ? সত্যই কি সত্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে না ? বাহিরের চক্ষে দেখিলে বোধ হয় বটে,—ধর্ম্মের মূলে সেই আদি সময়ে যে কয়েকটী মূল সত্য নিহিত ছিল, সেই কয়েকটী সত্য ভিন্ন নূতন সত্য পাওয়া যাইতেছে না ; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে একথার ভ্রম স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। এ ধর্ম্ম-জগতের অভ্রান্ত সত্যের কথা বলিতেছি। মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, আশা ভিন্ন ভিন্ন, সুখ ভিন্ন ভিন্ন, বাহ্যিক চেহারা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সত্য ভিন্ন ভিন্ন কথনই হইতে পারে না। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের ঘনীভূত মিলন, একমাত্র অভ্রান্ত সত্যে। স্বর্গ হইতে শব্দ হইল—মিথ্যা কথা বলিও না, ব্যভিচারী হইও না, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পার্থক্য, বৈষম্য ভুলিয়া একই সময়ে মস্তক পাতিয়া সেই সত্য গ্রহণ করিল। যুগ যুগান্তর গেল, কত বৈষম্য, কত বিভিন্নতা সোণার পৃথিবীকে গ্রাস করিল, কিন্তু ঐ সত্যে আর বিভিন্নতা দেখা গেল না। খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ সকলে একমত হইয়া বলিল—মিথ্যা কথা মহাপাপ। ইহাকেই বলে অভ্রান্ত সত্য। আমি তুমি নই, তুমিও আমি নও, এ পৃথিবীর বাজারের কথা, পৃথিবীতেই পড়িয়া পচুক। পৃথিবীর চিন্তাতে তুমি আমি বিভিন্ন, তোমার মতে আমার মতে পার্থক্য, কিন্তু স্বর্গীয় জিনিসে এক। তুমি যখন জ্ঞানের অনুসরণ কর, হয়ত আমি তখন প্রেমের খেলা খেলিতে থাকি, তোমার সহিত তখন আমি এক হইব কি রূপে ? পৃথিবীতে এত বিভিন্নতা, এত বৈষম্য এই জন্য যে, প্রত্যেকের সাধনা ও চিন্তার পথ বিভিন্ন গতিতে বিভক্ত। সংক্ষেপে বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা, জল, বায়ু, শিক্ষা জন্ম ইত্যাদিতে তোমাকে তুমিত্বে ও আমাকে আমিত্বে উপনীত করিতেছে ; নচেৎ তুমি আমি এক। এক কখন ?—যখন এক পথে হাঁটি। এক তখন, যখন এক চিন্তাতে মজি। আর এক তখন, যখন এক সত্যে—এক অভ্রান্ত সত্যে প্রাণকে ভাসাই। যে অভ্রান্ত সত্যে সব মানবহৃদয় এক—আমেরিকা ইয়ুরোপ,আফ্রিকা,আসিয়া এক ; সেই সত্য কেন সীমাবদ্ধ স্থানে রহিল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত আধ্যাত্মিক অভ্রান্ত সত্য সকল

কেন মানবজাতিকে একত্বে মিশাইতে পৃথিবীর বাজারে অবতীর্ণ হইয়া বিকাইল না? এত বিবাদ এত বিসম্বাদ, এত মতভেদ কেন সোণার সংসারকে মলিন করিল?—ভ্রাতায় ভ্রাতায় বক্ষ বিদারণ করিয়া কেন মরিল, কেন, ডুবিল? সত্য কেন দুষ্প্রাপ্য রহিল, মানুষ কেন সত্য ধরিতে অক্ষম হইল? একথার উত্তর অতি সহজ। যে বালকের বর্ণজ্ঞান হয় নাই, সেই বালককে কোন শিক্ষকই প্রথম পাঠ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পাঠ শিক্ষার্থে দেয় না। দিলেই বা কি হইবে, সে বালক তাহা বুঝিতে, তাহা ধরিতে, তাহা দেখিতে পায় না। ক্রম অনুসারে জ্ঞান। একটু জ্ঞান জন্মিলে, তবে মানব আর একটু জ্ঞানের অধিকারী হয়। যে ক খ শিখে নাই, শাস্ত্রাদর্শন তাহার নিকট আঁধার, থাকিয়াও নাই। যত সূক্ষ্ম বিচার করিবে, ততই বুঝিবে, ক্রম ভিন্ন উন্নতি নাই। যে বালক দুগ্ধপান করিয়া হজম করিতে পারে না, সে বালককে কোন পিতা মাতা অন্ন আহার করিতে দেয় না। যে রোগী সাগু হজমে অক্ষম, সে রুটী মাংস আহারে অনধিকারী; কোন বিজ্ঞ বৈদ্যই তাহাকে রুটী মাংস আহারের ব্যবস্থা দিবে না। দ্রব্য আছে তাতে কি? দুগ্ধ আছে, মাংস আছে, অন্ন আছে, পৃথিবীর বাজারে সকলই আছে। যে যাহা হজম করিতে পারে, সে তাহা পায়; কেবল যে তাহাই পায়, এমন নহে, আরো গুরুপাক দ্রব্য আহারে অধিকারী হয়। বালক প্রথমে মায়ের দুধ্ হজম করিল, পরে গরুর দুধ্ পাইল। যখন গরুর দুধ্ হজমে সক্ষম হইল, তখন পিতা মাতা সন্তানের অন্ন-প্রাশন করিলেন। বালক যখন মায়ের দুধ্ খাইত, তখন পৃথিবীর বাজারে রাশি রাশি খাদ্য দ্রব্য থাকিয়াও বালকের নিকট ছিল না। রোগীকে দেখ। রোগী রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথমে সাগু হজম করিল, পরে অন্যান্য দ্রব্য পাইল। যে রোগী সাগু হজমে অক্ষম, কোন বৈদ্যই তাহাকে অন্য গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা করে না। জ্ঞানের বাজারে ক্রম দেখিলে, স্বাস্থ্য-রক্ষার বাজারে ক্রম দেখিলে, প্রেমের বা দয়ার বাজারে যাও, সেখানেও ক্রম দেখিবে। শিশু মাটীতে পড়িয়া প্রথমে মাকেই দেখে, মাকেই ভালবাসে। পৃথিবীর আর সকল তাহার নিকট তখন থাকিয়াও থাকে না, মাতাই তখন তার সকল। মাকেই সে তখন ভালবাসে। মাকে যে ভালবাসিতে পারিল, সে পরে মায়ের পেটের ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিতে পারিল,—পরে ঘনিষ্ট আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভালবাসিল,—পরে স্বদেশের লোকদিগকে,—পরে জগৎকে, ক্রমে ক্রমে অনন্তের দিকে

প্রাণ ছুটিল। আগে সীমাবদ্ধ, পরে অনন্ত। দয়াও বিন্দু বিন্দু করিয়া লোকে শিক্ষা করে। প্রাণে ডুবিয়া যাও, এ কথা বুঝিতে পারিবে। একবিন্দু দয়াও যে প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝে নাই, অনন্ত দয়া তাহার নিকট স্বপ্ন; কাহাকেও যে নিজে ভালবাসে নাই, বিশ্বপ্রেম তাহার নিকটে কল্পনা। শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, প্রেম একটুকুও যাহার মধ্যে নাই, সে অনন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, প্রেম কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। তাহার নিকট ও সকল স্বপ্ন। যে মানুষ, মানুষকে বিশ্বাস করে না, ভালবাসে না, দেশকে ভালবাসে না, সে মানুষের অনন্ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া ভালবাসিতে পারা অসম্ভব। এই জন্যই জগতে নাস্তিক নামে একশ্রেণীর লোকের কথা শুনা গিয়া থাকে। নাস্তিক এ জগতে তাহারা, যাহারা ক্রমকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আকাশে উঠিয়াছে—মাটীতে পড়িয়া যাহারা কেবলই অবিশ্বাস, অপ্রেম, অজ্ঞানের বাজারে ভ্রমণ করিয়াছে। নাস্তিক তাহারা, যাহারা আপনাকে মানে নাই,—বিশ্বাস করে নাই,—ভালবাসে নাই; মাকে মানে নাই,—কেবল আকাশে,—কেবল কল্পনার রাজ্যে,—কেবল শূন্যে বিচরণ করিয়াছে। সীমাবদ্ধ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তবে অনন্তে যাওয়া যায়, সঙ্কীর্ণ জরায়ু গর্ভে বাস করিয়া তবে এত বড় পৃথিবীর মুখ সন্দর্শন করা যায়। জরায়ু-গর্ভকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কি পৃথিবীতে আসিতে পারে? সীমাবদ্ধকে যে অবহেলা করিল, সে কি কখনও অনন্তে যাইতে পারিবে? আপনাকে সংস্কার কর, পল্লীকে সংস্কার কর, গ্রামকে সংস্কার কর, পরে দেশকে সংস্কার কর, তবে ভারতসংস্কার সম্ভব; আপনাকে ভুলিয়া, পল্লীকে ভুলিয়া, গ্রামকে ভুলিয়া ভারত-সংস্কারের চেষ্টা কেবলই কল্পনা, কেবলই চীৎকার। উহা কিছুই নহে, উহা মহাভ্রান্তি। বড় সে হইবে, যে ক্ষুদ্র শরীর পাইয়া তাহার আদর ও যত্ন করে। মায়ের কোলকে উপেক্ষা করিয়া যে বালক একেবারে সংসারে যায়, তাহার গায়েই কুবাতাস লাগে। ঘরে বসিয়া বল সঞ্চয় করিলে পরে সংসারযুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা। উচ্চ সে হইবে, যে নিম্নকে আদর করিয়া, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, উচ্চের দিকে ধাবিত। কূল পাইলে তবে অকূল কি, ধারণা হয়; সীমাবদ্ধ কিছু জানিলে তবে অনন্ত কি, কতক ধারণা হয়। যে কূল কি, জানে না, অকূল তাহার নিকটে কল্পনা। এইজন্যই এ সত্য অভ্রান্ত,—একটু যে জানে না, অনেক সে জানে নাই—অনেক সে জানিবে না। আজ একটু যে জানে, কল্য সে অনেক জানিতে

পারিবে,—আজ যে মায়ের দুধ্ হজম করিতে পারে, সে একদিন পৃথিবীর অন্ন আহার করিলে হজম করিতে পারিবে। এ সকল সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনি। একটী সত্য বুঝিলে তবে অন্য সত্য বুঝা যায়, একটী সত্য পাইলে তবে অন্য সত্য ধরা যায়। পৃথিবীতে যে সত্য আসিতেছে না, অথবা মানব যে নূতন সত্য পাইতেছে না, তাহার এক মাত্র কারণ এই, যে সত্য পৃথিবীতে আছে, তাহাও পালিত, রক্ষিত, ভক্ষিত হইতেছে না। পৃথিবীর দুগ্ধ, অন্ন, রুটী যেমন মানবের শরীরের আহার, সত্য তেমনই আত্মার আহার। অজীর্ণ হইলে যেমন মানব দুধ্ বল, ভাত বল, সকল দ্রব্যাহারেই অনধিকারী হয়; আত্মার অজীর্ণ হইলে সত্যাহারেও তেমনি অরুচি জন্মে, মানব অনধিকারী হয়। অরুচি জন্মিলে মৎস্য বা কার, দুগ্ধ বা কে খায়? অরুচি হইলে সত্যেরই বা কে আদর করে, সত্যই বা কে খায়? এক অরুচি শরীর-নাশক, আর এক অরুচি আত্মা-নাশক। আহার করিও না, শরীর শুকাইয়া যাইবে। সত্য পালন করিও না, নিশ্চয় জানিবে, আত্মা শুকাইবে। কিছুদিন আহার করিও না, দেখিবে পাকশক্তি হ্রাস হইবে, হইবেই হইবে, ইহা বিজ্ঞানের অকাট্য সত্য। কিছুদিন সত্যপালন করিও না, সত্যগ্রহণ, ধারণ ও পালন শক্তি হ্রাস হইবেই হইবে। কি কুক্ষণে জানি না, পৃথিবীতে ভয়ানক মত-ম্যালেরিয়া আসিয়া মানবের অরুচি জন্মাইয়া দিয়াছে, এখন সত্য বুঝেই বা কে, ধরেই বা কে, রাখেই বা কে? ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রণোদিত মত এখন সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে—তাহা লইয়াই মানব দলাদলী—কাটাকাটী, মারামারী করিয়া বিচ্ছেদের আগুন প্রজ্বলিত করিতেছে। এমনই অরুচি জন্মিয়াছে, যাহা সত্য—ব্যক্তিত্ব নহে, তাহা আর ভাল লাগে না;—যে মহামূল্য দ্রব্য আছে, তাহাও আর কেহ হাতে ধরিয়া মুখে দেয় না। আহার জগতের উন্নতি হইয়াছে, কেবল অনুসন্ধানে। যখন দুধে পেট ভরে না, তখন বালক মাটীতে নামিয়া অন্য বস্তু ধরে, ধরিয়া পরে মুখে দেয়। মুখে দিতে দিতে ভাল দ্রব্য পায়। সকল উপকারী ভাল বস্তু দুই প্রকারে মানবের ভাগ্যে যুটিয়াছে,—অনুসন্ধান ও ক্ষুধা। ক্ষুধা ছিল, তাই মানুষ বাঁচিয়াছে, অনুসন্ধান ছিল, তাই মানুষ ক্রমেই স্বাস্থ্য-হানিকর দ্রব্য পরিহার করিয়া ভাল দ্রব্য খাইয়া সুস্থ হইতেছে। ক্ষুধা না থাকিলে অনুসন্ধান বা কে করে, অনুসন্ধান না করিলে আহার বা কে পায়? সত্য আসিবে কি?—পৃথিবীতে যে সত্য আছে, তাহা আহার

করে, এমন লোকও আর দেখা যায় না—এমনই অসত্য-ম্যালেরিয়ায় অরুচি জন্মিয়াছে। সত্য-ক্ষুধা নাই—অনুসন্ধান তাই একেবারেই নাই; যে সত্য আছে, তাহাও নিষ্প্রভ, যেন মিটি মিটি করিতেছে, মিটি মিটি করিতে করিতে এক একবার অন্তর্হিত হইতেছে, আবার কখনও বা কোন মহাত্মার প্রজ্বলিত ক্ষুধার ইন্ধনে জ্বলিয়া উঠিতেছে। সত্য কোথায় নাই? সত্যময় এই জগৎ,—আকাশে সত্য, পাতালে সত্য, হৃদয়ে সত্য, বাহিরে সত্য,—অনন্ত সত্য, চতুর্দ্দিকে অনন্ত ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দেখে বা কে, খোঁজে বা কে, ধরে বা কে, আহার বা কে করে? যে জন একটী সত্য আহার করিয়া হজম করিয়াছে, সেই মনুষ্যই অন্য একটী সত্য বুঝিতে পারে,—অন্য সত্য আহারে অধিকারী হয়। আহার কেবল কথা নহে। আহারে—শোণিত, শক্তি, স্বাস্থ্য, বল, তৃপ্তি সকলই। শুধু কথার কথা লইয়া মানব ক্রীড়া করিতেছ, তুমি দূর হও। সত্য আহারে তুমি যদি রত থাকিতে, তবে তোমার তেজ দেখিতাম, সৌন্দর্য্য দেখিতাম,—অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি দেখিতাম। আহার করিয়াছ, অথচ বল পাও নাই, শক্তি পাও নাই, আহারে আরো স্পৃহা জন্মে নাই, একথা বিশ্বাস করি না। আহার করিলে করিতে পার, কিন্তু হজম তোমার হয় নাই, অপাক জন্মিয়াছে। হজম হয় ভিতরে—চক্ষুর অদৃশ্য সেই নিভৃত কক্ষে, যেখানে চন্দ্র সূর্য্যের পরাক্রম নাই—কিছুই নাই। হজম হইলে তেজ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। যে সত্য হজম করে, সে নূতন সত্য-আহার পায়। যে সত্য হজম করে, তাহার সত্য-ক্ষুধা বাড়ে—বাড়েই বাড়ে। সে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া আকাশ পাতালকে তোলপাড় করিয়া তবে নূতনতর সত্য বাহির করিয়া আনিয়া খায়,—খাইয়া বাঁচে। জ্ঞানীরা পৃথিবীতে কি করিতেছেন, তোমরা কি জান না?—আফ্রিকার ভীষণ সাহারার প্রচণ্ড রৌদ্রকে তুচ্ছ করিয়া, আটলাণ্টিক মহাসাগরকেও অবহেলা করিয়া, কত জ্ঞানী জ্ঞানের ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, কত বিপদ মস্তকে লইতেছেন! তুমি আমি কি কিছু আবিষ্কার করিতে পারি?—পারি কি আমরা, যাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা নাই—জ্ঞানে যাঁহাদের স্পৃহা বা রুচি নাই? সত্য কে পায়?—যে সত্য হজম করিয়াছে। কত শতাব্দী গেল, চাহিয়া দেখ—ঐ শাক্যসিংহ নিরঞ্জনা নদী তীরে সত্য-ক্ষুধায় বিহ্বল হইয়া কি করিয়া গিয়াছেন! সত্য নাই এ কথা বল? মুখ তুলিয়া দৃষ্টিকে বহু শতাব্দীর পশ্চাতে লইয়া যাও, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, নানক, শাক্য কি করিতেছেন, দেখ। সত্য-পিপাসু সত্যকে

হজম করিয়া যাই বলিলেন—"অনন্ত সত্য-সিন্ধু, ক্ষুধায় কি আমরা মরিব? সত্য দেও, সত্য দেও, সত্য দেও," এই কথা বলিতে না বলিতে চতুর্দ্দিক হইতে শত ধারে, সহস্র ধারে বর্ষিত হইয়া সত্য নামিল, সত্য বন্যা হইল, সত্য-প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল। আকাশ হইতে সত্য নামিল, বৃক্ষ বক্ষ বিদারণ করিয়া লুক্কায়িত সত্য প্রদান করিল, পর্ব্বত ভয়ে অস্থির হইয়া বুক চিরিয়া গুপ্ত সত্য বাহির করিল। পাখী গাইল, আকাশ কাঁপিল, মেদিনী ধন্য হইল। হায়, সে দিন আজ কোথায়? সে আহার কোথায়? —সে ক্ষুধা কোথায়? সে অনুসন্ধানই বা কোথায়? আজ সময় বুঝিয়া সত্য আবার লুকাইয়া যাইতেছে,—পর্ব্বতের গুহায়, বৃক্ষের পল্লবে, আকাশের মেঘে। পৃথিবীর মানবাত্মার আহারকে সকলে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সত্যের স্নিগ্ধ মোহময় স্থানকে, ব্যক্তিগত মত, কলহ বিবাদের মূল সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া গ্রাস করিতেছে। আজ মানুষ অন্ধ;—আর সত্য দেখে না, পায় না, ধরে না। সত্য আর আসে না, যাহা ছিল তাহাও যায়। —যায়, যায়, আর থাকে না, একে একে সব নিবিল। একে একে সব মানব-চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইল। কে সত্যকে রাখিবে, কে ধরিবে, কে বুঝিবে? হায়, ঐ আকাশে লুকায়, ঐ পালায়। অধর্ম্ম, অত্যাচার, অসত্যপীড়নে সত্য যায়। অসত্য-ক্ষুধায়-বিহ্বল মানব আর সত্যকে বুকে ধরিতে পারিল না। আজ মানব মুখে হাহাকার করিতেছে, কিন্তু প্রাণে তৃষ্ণা নাই, ক্ষুধা নাই; এই জন্যই সত্য আসিতেছে না, বরং যাহা ছিল, তাহাও যাইতেছে। আসিতেছে না, ইহার অর্থ এই— কেহ তাহা দেখিতেছে না, গোপনের ধন গোপনেই থাকিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে সত্য আহার হইয়া মানবাত্মাকে পরিপোষিত করিত, এখন সে স্থানে ব্যক্তিগত মত অধিষ্ঠিত হইয়া মুখে মুখে রহিয়াছে। এমনই অরুচি, সত্য আর গলাধঃকরণ হয় না, মুখেই থাকে। মত লইয়া এক্ষণ লোক মজিতেছে, ডুবিতেছে, কে বা আহার করে, আর কে বা হজম করে! মত মুখের নিম্নে আর যায় না, কিসে আর জীবন রক্ষা হইবে, কিসে আর আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে? এইজন্য বর্ত্তমান সময়ে বোধ হইতেছে, যেন আর নূতন সত্য আসিতেছে না। একদিকে সন্দেহবাদ, অপরদিকে মতবাদ, এই দুইবাদ জোঁট করিয়া সত্যকে পরাস্ত করিয়াছে। মানবের ক্ষুধা গিয়াছে, অমনি স্বর্গের আহার লক্ষ্য ভুলিয়া

আবার মায়ের স্তনে লুকায়িত হইয়াছে। কথায় শরীর রক্ষা হয় না, আহার করা চাই। মতে আত্মরক্ষা হয় না, সত্যপালন চাই। সত্যকে প্রাণের জিনিষ কে করিতে পারিয়াছে? পৃথিবীতে স্বাধীনতার বংশীরব উঠিয়াছে—অনৈক্যতা, বিভিন্নতা—বৈষম্য, সকলেই পর পর, এই ধ্বনিতে কর্ণকুহর বধির হইতেছে, কিন্তু একতার মধুরধ্বনি কোথায়? তোমার প্রাণ যে সত্যের জন্য অস্থির, আমার প্রাণ যদি ঠিক সেই সত্যের জন্য কাতর হইত, তবে ভাই, তোমার প্রাণ আমার প্রাণে মিলিত; মিলিতই মিলিত। এক পথে হাঁটিলেই মিলন হয়, বিভিন্ন পথে কদাপি নহে। বৈষম্যের বংশীধ্বনি কেবলই কর্ণ পাতিয়া শুনিতেছ, চিরকাল কি তাহাই শুনিবে?—সাম্যের মধুর গীতি কি শুনিবে না? বিভিন্নতার মোহময় ফাঁদেই পড়িয়া ছট্‌ফট করিবে, একতার মধুময় জালে কি ধরা পড়িবে না? ব্যক্তিগত মতেই বিভিন্নতা—বৈষম্য, অধর্ম্ম; সার্ব্বভৌমিক সত্যে—একতা, সাম্য, পুণ্য, ধর্ম্ম। সত্য যখন মতকে গ্রাস করিয়া অন্নপানের ন্যায় শরীরস্থ হয়, তখনই মানবের জীবন বিকাশ পায়। সত্য যখন প্রাণে মিলিয়া মিশিয়া যায়—সত্যজ্ঞান, সত্যধ্যান, সত্যপান যখন হয়, তখনই মানব-জীবন বিকশিত হয়। ব্যক্তিগত মতের কথা অনেক শুনেছি, এখন জীবনের কথা শুনিতে চাই। মতের ঝগড়া অনেক করেছি, এখন সত্যকে আহার করিতে চাই। জীবন, মত-ম্যালেরিয়ায় বিনষ্ট হয়, সত্য আহারেই স্ফূর্ত্তি পায়। বাহিরে সত্য আছে কি নাই, তাতে আমার কি, যতক্ষণ তাহাতে আমার রুচি না হইবে,—যতক্ষণ আমি তাহাকে আহার ও পান না করিব, ততক্ষণ আমার জীবন রক্ষা পাইবে না। মত-ম্যালেরিয়া এমনই ভয়ানক অরুচি জন্মাইয়া দিয়াছে যে, আর সত্যে রুচি নাই। তবে কি জীবন যাইবে?—তবে কি আত্মা বিনষ্ট হইবে? একটী সত্য আহারে প্রবৃত্তি নাই, এমন অবস্থায় অন্য সত্য কেমনে পাইব? হায়, আজ কোথায় যিশুখ্রীষ্ট, কোথায় চৈতন্য, কোথায় নানক, আর কোথায় বুদ্ধদেব? হতভাগ্য মানবসমাজকে মত-ম্যালেরিয়া গ্রাস করিয়া ক্ষুধা-মান্দ্য জন্মাইয়া, শরীরের তেজ, কান্তি, সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, আজ তোমরা কোথায়? তোমরা আর একবার অবতীর্ণ হও,—সত্যসিন্ধুকে লইয়া অবতীর্ণ হইয়া সত্য পান করিয়া আমাদিগকে দেখাও, তোমাদিগের জীবন্তভাবে অনুপ্রাণিত কর, আমরা ধন্য হইয়া যাই, পৃথিবী শান্তি-সুখ পাইয়া কৃতার্থ হউক। শুষ্ক মরুতে পড়িয়া আর পৃথিবী থাকিতে

পারে না। পৃথিবী চায় সত্য, পায় মত; পৃথিবী চায় শান্তি, পায় অশান্তি; পৃথিবী তৃষিত সাম্যের জন্য, পায় কেবলই বৈষম্য; মানব লালায়িত একতার জন্য, ঘটে কেবলই বিচ্ছেদ। বৈষম্যের ঘোরতর আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—মত-ম্যালেরিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া তাহাতে ইন্ধন দিতেছে,—স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার ভাণ করিয়া তাহাতে আহুতি দিতেছে! কোথায় জীবন্ত সত্য, তুমি একবার অবতীর্ণ হও। প্রাণে প্রাণে মিলাও, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাও! মানুষ এক সত্যে মিলিয়া আর এক সত্যের রাজ্যে যাইয়া ঘনীভূত মিলন পাউক। মিলিতে মিলিতে কোটী কোটী কণ্ঠ এক হইয়া,কোটী কোটী হৃদয় মিলিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্যেরই জয় ঘোষণা করুক, আর তাহাতে মজুক, আর তাহাতে ডুবুক, আর তাহা লইয়া থাকুক। আমরা সকলে সত্যশাস্ত্র শিখিতে শিখিতে আরো শিখি, সত্য পাইতে পাইতে আরো পাই। সীমাবদ্ধ শাস্ত্র অসীম হউক, ক্ষুদ্র মানব প্রাণ ক্ষুদ্রত্বে আরম্ভ করিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হউক। কোটী ভাঙ্গিয়া সহস্র হউক, সহস্র শত, শত মিলিয়া এক হউক। সকল স্বর এক হইয়া, একই সত্য প্রচার করুক; সকল হৃদয় এক হইয়া, একই সত্য পান করুক। সেই ঘনীভূত মিলনের রাজ্যে—যেখানে সাম্য আছে, বৈষম্য নাই; একতা আছে, অনৈক্যতা নাই; স্বজন আছে, পরজন নাই; স্নিগ্ধতা ও কোমলতা আছে, কঠোরতা নাই;—সুখ শান্তি আছে, বিচ্ছেদ দুঃখ নাই; জ্ঞান আছে, অহঙ্কার নাই; স্বাধীনতা আছে, স্বেচ্ছাচারিতা নাই; সেই ঘনীভূত সত্যপ্রেম রাজ্যে যাইবার জন্য সকলে একবার মাত দেখি, বঙ্গদেশ স্বর্গে পরিণত হয় কি না, ঘনীভূত মিলন ঘটে কি না, ঘনীভূত শান্তি পাওয়া যায় কি না?

## ভক্ত কেশবচন্দ্র।

পৃথিবীতে এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে—মহাত্মা ভক্ত কেশবচন্দ্র আর ইহ-সংসারে নাই। এই সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে—আজ কোটী কোটী নর নারীর হৃদয়ের গভীর দুঃখোচ্ছ্বাস একতানে মিলিয়া অনন্ত প্রেমের রাজ্যে সেই অমরাত্মার উদ্দেশে ছুটিয়াছে। এ দৃশ্য যে দেখিল, সেও ধন্য হইল, এ চিত্র সহানুভূতির তুলিকা দ্বারা যে

হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিল, সেও পবিত্র হইল। ধন্য কেশব, ধন্য তোমার জীবন;—তোমার ন্যায় স্বর্গীয় জীবন এই প্রেমভক্তিহীন বঙ্গে আর কে পাইয়াছে?

সাময়িক ইতিহাস লিখিয়াছে—কেশব মরিয়াছে; অনন্ত প্রেমভক্তির ইতিহাস লিখিতেছে—কেশব এই মাত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। মনুষ্যের অনন্ত জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন জরায়ু গর্ভে স্থিতিমাত্র,—মৃত্যু সংসারীর চক্ষে মৃত্যু,—বিশ্বাসীর চক্ষে মৃত্যু প্রকৃত নব জীবন লাভ। বিশ্বাস বলে আজ ভক্তজগৎ কেশবকে অন্তর চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছে,—নচেৎ তাঁহাদের হাহাকারে আজ গগন বিদীর্ণ হইত,—চতুর্দ্দিক আঁধার আঁধার বোধ হইত; লোক-সমাজ আজ শ্মশান-বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইত;—এ বিচ্ছেদ আজ আর সহ্য হইত না। কেশব মানবের যে চক্ষুর নিকট ফুটিলেন, এ চক্ষুর জ্যোতি আর কখনও নিস্তেজ হইবে না,—অনন্তকাল মানবের এ চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে—তাঁহার ছায়া ধরিবে—তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবে। পৃথিবীর যে চক্ষু দুদিন পরে অন্ধ হয়—সে চক্ষুর রাজ্য কেশব অতিক্রম করিয়াছেন। পৃথিবীর জল বায়ু সে শরীরের উপর আর ক্ষমতা বিস্তার করে না বলিয়া যাঁহারা কেশবকে মৃত বলিতেছেন, তাঁহারা আজও সংসার-ধূলি-খেলায় মত্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা আজ পৃথিবীর সকলি দেখিতেছেন—, সেই পূর্ব্বের জাগতিক শোভা—বৃক্ষের ফুটন্ত ফুল—সেই সৌরভ, সেই সুশীতল বায়ু, সেই সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমার রশ্মি, সেই নীলিমাময় আকাশের নক্ষত্র—সেই পক্ষীর কলকণ্ঠের মধুর মধুর ধ্বনি—সেই আমোদ—সেই উৎসাহ—সেই গীতি—সেই সকলি তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছে; কিন্তু একজন আজ তাঁহাদের নিকটে নাই। নাই—শিক্ষার আদর্শ, প্রকৃত ভক্ত কেশবচন্দ্র। এ কষ্ট আজ তাঁহাদের নিকট অসহ্য—এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় তাঁহারা আজ মৃতবৎ। কিন্তু যোগীগণ—প্রকৃত বিশ্বাসীগণ আজ কেশবের নূতন জীবনের; নব ছায়া দেখিয়া গভীর শোকরাশির ভিতরে গভীরতম আনন্দ অনুভব করিতেছেন। স্বীয় স্বীয় অভাব স্মরণে তাঁহারা কাঁদিলেন, হাহাকার করিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তির যোগবলে ভক্তের নবজীবনের নবভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ ক্রন্দনের সময়ে আবার হাসিলেন, আবার উল্লসিত হইলেন। এ দৃশ্য দেখিল পৃথিবী কাহার মৃত্যুতে?—ইতিহাস অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিল—কেশবের মৃত্যুতে। কেশব পৃথিবীতে মরিলেন নূতন শিক্ষা দিতে—

নবজীবন লাভ করিতে। একথা যাঁহারা স্বীকার করিল, বিশ্বাস করিল—তাঁহারা আজ সংসারে থাকিয়াও যোগ-বলে সংসারের অতীত স্থানের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া হাসিল—শান্তি পাইল,—কেশবের হাসিতে তাঁহাদের হাসি অলক্ষিত ভাবে মিশিল। কিন্তু এ প্রকার যোগীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আমরা মৃত্তিকার জীব, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ অস্থির হইতেছি। কেশব সংসার-মৃত্যুর ভস্মরাশির ভিতর হইতে পুনঃ জন্মলাভ করিয়া অনন্ত জীবনের অনন্ত পথে অনন্ত দেবতার উদ্দেশে ছুটিলেন; পৃথিবী এ ভাব না বুঝিয়া কোটী কোটী বৎসর ক্রন্দন করিলেও আর সেই মহাত্মা ফিরিবেন না—এই শোক-সন্তপ্ত, প্রলোভন-প্রপীড়িত—পাপবিভীষিকা-ময় পৃথিবীর চর্ম্ম চক্ষের দৃষ্টির অধীন হইবেন না। সেই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি—সেই ভক্তি বিশ্বাসের জ্বলন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ ছবি—সুন্দর হইতে সুন্দরতম বিস্ফারিত লোচন, সেই প্রস্ফুটিত অমৃতবর্ষী সুকোমল বদন আর পৃথিবীর চর্ম্ম-চক্ষু দেখিবে না—পৃথিবীর বায়ু স্পর্শ করিবে না, পৃথিবীর সুখ সম্পদ আকর্ষণ করিতে পারিবে না। তবে যাও, কেশব, অনন্তধামে—যেখানে ন্যায়ে স্বার্থ নাই,—পুণ্যে মলিনতা নাই—বিচারে কলঙ্ক নাই। এই পাপবিষাক্ত বঙ্গে এমন কি পদার্থ আছে যে, তোমা হেন রত্নকে ক্রোড়ে রাখিয়া জীবনকে সার্থক করিতে সমর্থ হইবে?—এই মলিন বঙ্গে তোমার উপযুক্ত স্থান নাই!—অনন্ত উন্নতির পিপাসা বিধাতা তোমার অন্তরে ঢালিয়া দিয়া তোমাকে কেন এমন সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন,—যেখানে তোমার মন ক্রীড়ার বস্তু পায় না, হৃদয় অবলম্বন পায় না—যেখানে সমদুঃখী সমসুখী বা প্রকৃত সমবিশ্বাসী সহায় মিলে না—ধর্ম্মপথের প্রকৃত ভক্ত বিশ্বাসী বন্ধু পাওয়া যায় না? তুমি থাকিতে চাও নাই, তাই বিধাতা তোমাকে রাখিলেন না, তাই মৃত্যুর ভিতর দিয়া অনন্ত উন্নতির জীবন্ত-পথে তোমাকে লইলেন। তুমি ধন্য হইলে! ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল! আর হতভাগ্য ভারতবর্ষ?—আর হতভাগ্য পৃথিবী?—তোমকে হারাইয়া কাঁদিল, অধীর হইল। পৃথিবী কাঁদিবে না কেন?—তোমার স্বার্থ স্মরণে আমাদের স্বার্থ চিন্তা আরো প্রজ্বলিত হয়, তোমার উন্নতিতে আমাদের উন্নতির আশা আরো জাগিয়া উঠে। তুমি স্বার্থের পথে, উন্নতির পথে চলিলে, তাহাতে আমাদের স্বার্থে যে কণ্টক পড়িল, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? এই অভক্ত, অবিশ্বাসী, এই অপ্রেমিক বঙ্গ তোমার নিকট বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম শিখিতে চাহিয়া-

ছিল,—আমরা তোমার মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাস ও নাস্তিকতাকে অলক্ষিত ভাবে পরাজয় করিতেছিলাম, বঙ্গ কৃতার্থ হইতেছিল, ভারতবর্ষ প্রকৃত জীবন পাইয়া মাতিয়া উঠিতেছিল। তুমি বঙ্গের একমাত্র আশা ভরসা ছিলে। ভারতের সুসন্তান! তোমার দিকে চাহিয়া সহস্র সহস্র নর-নারী ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতেছিল। তোমার কথায়, তোমার ভাবে, তোমার জীবন্ত দৃষ্টান্তে সকলের প্রাণের ভিতরে এক আশ্চর্য্য ভারতরঙ্গ খেলিতেছিল। তুমি কত জনের হৃদয় মন অধিকার করিয়াছিলে, তাহার গণনা কে করিতে পারে? বঙ্গের সুসন্তান, তুমি বঙ্গকে কাঁদাইয়া,—ভারতকে মলিন করিয়া আপনার পথে মায়ের আদেশে চলিলে, ভক্ত সন্তানের পরিচয় দিলে;—আমরা হতভাগা, অভক্ত, অবিশ্বাসী, তোমার জন্য আজ হাহাকার করি, শূন্য হৃদয় লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরি! তুমি যাও অনন্ত ধামে, সেখানে মায়ের ক্রোড়ে সুখে থাক,—শান্তির অধিকারী হও।

কেশবচন্দ্র কে, কেশবচন্দ্র কি ছিলেন, এই বিষয় লইয়া দিন কয়েক খুব আন্দোলন চলিয়াছিল। কেহ বলিলেন—তিনি উচ্চ বংশে উচ্চ পিতার ঔরসে জন্মিয়াছিলেন—সৎ বংশের সৎ সন্তান। কেহ বলিলেন, তিনি জ্ঞানী, প্রতিভাশালী ছিলেন। কেহ বলিলেন, তিনি তর্কশাস্ত্র জানিতেন না—বিজ্ঞান জানিতেন না। কেহ বলিলেল, কেশব অহঙ্কারী ছিলেন, ধার্ম্মিক ছিলেন না। কেহ বা মৃত্যুর পূর্ব্বের জ্বালা যন্ত্রণার চিত্র দেখাইয়া জগৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন। কেহ বলিলেন, কেশবের ন্যায় ভাল বক্তা আর নাই; কেহ বলিলেন—এমন বুদ্ধিমান আর হইবে না। কেহ বা তাঁহার সৎসাহাসের পরিচয় দিলেন, কেহ বা সংস্কারক বলিলেন। তিনি জীবনে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা দিয়া কেহ বা কেশবকে বড় লোক বলিলেন। এই দেশে এরূপ হওয়াই সম্ভব। কেশব কে, তিনি কি ছিলেন, তাহা বুঝিতে পৃথিবীর এখনও শত শত বৎসর বাকী আছে। যে কার্য্যের উপাসক, সে কার্য্যের ভিতর দিয়াই কেশবকে চিনিয়াছে, কেশবের অন্য গুণ জানা তাহার পক্ষে অসম্ভব। যে জ্ঞানের উপাসক, সে জ্ঞানের রাজ্যে কেবল কেশবকে দেখিয়াছে, অন্য কোন গুণ জানা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই প্রকার মানব সমাজের কত লোক কত নূতন নূতন চক্ষে কেশবকে দেখিতেছেন! পবিত্রাত্মারা কেশবকে এক দিকে পবিত্র বলিতেছে, পাপীরা অপর দিকে কেশ-

বের দোষের উল্লেখ করিয়া চরিত্রের দোষ ঘোষণা করিতেছে। ইহাই সম্ভব। কেশব প্রকৃত পক্ষে কি ছিলেন, তাহা জানিতে পৃথিবীর এখনও অনেক দিন লাগিবে। আমরা যদি কেশবচন্দ্রের কোন গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে তাহাও এই কারণে একদেশদর্শী হইবে, সমুচিত হইবে না। যে যেমন লোক, সে অন্যকে তাহার অতিরিক্ত কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে না। আমাদের এমন শক্তি নাই যে, সেই পরলোকগত মহাত্মার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভাবে জগতের নিকট উপস্থিত করিতে পারি। আমরা এবম্প্রকার চেষ্টার অধিকারী কি না, এক মাত্র বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা মানবের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অনুরোধে আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্যপালনে বিরত থাকিলাম না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কেশবচন্দ্র কেবল যদি সংসারের লোক হইতেন, তবে আজ আমরা তাঁহার কথা লইয়া এত সময় বৃথা ব্যয় করিতাম না। কেশবচন্দ্র সংসারের অতীত জীব ছিলেন—প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁহাকে বঙ্গের গৌরব মনে করি। পৃথিবীতে জ্ঞানী অনেক আছেন, বক্তা অনেক আছেন, দার্শনিক পণ্ডিত অনেক আছেন, প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। জ্ঞানে ভারত এক দিন পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এ কথাতে হয় ত কাহারও সন্দেহ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসে ভারত শ্রেষ্ঠ, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। কেশবচন্দ্র ভক্তপ্রধান ভারতের ভক্ত সন্তান। ভক্তি বিশ্বাস বাদ দিলে, পৃথিবীতে কেশবের সমতুল্য লোক আজ অনেক দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন ভক্ত বিশ্বাসী আর কয়টী আছে, আমরা জানি না। ভারতের এক মাত্র সম্পত্তি ভক্তিতে কেশবের আর সমস্ত গুণ মিশ্রিত থাকায় কেশবকে আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন। কেশব যোগী, কেশব ভক্ত, এই জন্য আমরা কেশবকে এত সম্মান করি, এত আদর করি—বুঝি না, বুঝিতে পারি না, তবুও প্রাণের ভিতরে কেশবকে পুরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। কেশবের ভক্তি বিশ্বাস প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিতে পৃথিবীর আরো অনেক সময় লাগিবে। কথায় বুঝা আর প্রত্যক্ষ করা, এক কথা নহে। কেশব যে পথের পথিক ছিলেন, আমরা যে পরিমাণে সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিব, সেই পরিমাণে তাঁহাকে বুঝিতে পারিব। কত দিন আসিবে,

কত দিন যাইবে, তবে কেশবকে মানবজাতি প্রকৃতভাবে চিনিতে পারিবে। অভক্ত অবিশ্বাসী সংসার কেশবের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, ঐ চিত্র কেশবের প্রকৃত চিত্র নহে, উহা ধূলির জিনিস, মৃত্তিকায় মিশিবার উপযুক্ত,—উহা কেশবের নশ্বর শরীরের সহিত চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে। কেশবের জীবন যাহা, প্রাণ যাহা, তাহা ঐ চিতার ভস্ম হইতে সংস্কৃত হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। কেশবের ভক্তি, জ্বলন্ত বিশ্বাস, অবিনশ্বর অক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাসে, মানবের হৃদয়ে লিখিত থাকিবে। কেশব পৃথিবীর ভক্ত সাধক শ্রেণীর মধ্যে আসন পাইয়াছেন। কেশবকে যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, ঐ ভক্তির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। কেশবের কথায় ভক্তি, দৃষ্টিতে ভক্তি, হৃদয়ে ভক্তি—জীবন ভক্তিময়। ভক্তিতে আরম্ভ, ভক্তিতে কেশবের শেষ—ষোড়শ বৎসরের শিশু কঠোর নীতির কষাঘাতে হৃদয় মনকে মাজিয়া যে ভক্তির জ্বলন্ত কথা লিখিয়া রাখিয়াছিল, সেই ভক্তি জীবনের শেষ কথায় স্ফূরিত,—"মা, আমার দ্বারা এই পর্য্যন্ত হইল।" কেশব পৃথিবীতে এমন অতি অল্প কথা বলিয়াছেন, যাহাতে ভক্তির লেশ মাত্র নাই। ভক্তের জীবন পাঠ, ভক্ত সহবাস লাভ, ভক্তি ব্রত, ভক্তি ধ্যান, ভক্তিই কেশবের একমাত্র সম্পত্তি ছিল। ভক্তবৎসল হরির নাম কেশবের একমাত্র সম্বল ছিল। ধ্যানে হরি, চিন্তায় হরি, কথায় হরি, সুখে হরি, সম্পদে হরি;—হরিকে লইয়া কেশব। হরি বাদে কেশব অসার মৃত্তিকার জীব, অকিঞ্চিৎকর—অনাদরের। হরিকে ভুলিয়া কেশব পৃথিবীতে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া কত বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে, তাহা মাটীর জিনিস মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে,—লোক সে কথায় তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াছে। হরিকে ভুলিয়া কেশব জগতে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব বায়ুতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর ঘৃণার জিনিস হইয়াছে। মানুষ দেবতা, মানুষ পশু। ঈশ্বরভক্তিতে মানুষ দেবতা, ঈশ্বর অবিশ্বাসে মানুষ পশু। হরিকে সম্মুখে রাখিয়া, অন্তরে রাখিয়া, প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কেশব যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল মানবের পূজা পাইবে, চিরকাল মানবের কল্যাণসাধন করিবে। হরিকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কেশব যখন যে কথা বলিয়াছেন, তখন সে কথা চকিত হইয়া ঊর্দ্ধ-কর্ণে পৃথিবী শুনিয়াছে,—সে স্বর, মধুর কথা মানবরাজ্যের চিরসম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে, লোক-সমাজ কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না,—ভুলিবে

না। হরি ভিন্ন কেশব আঁধার, ভক্তি ভিন্ন কেশব মৃত্তিকার জীব—অসার। কেশবের জীবনে হরি, মৃত্যুতে হরি। হরির নাম প্রচারের জন্য কেশবের জন্ম, হরির ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কেশবের মৃত্যু। তাঁহারই ইঙ্গিতে কেশবের জন্ম. তাঁহারই ইচ্ছায় কেশবের অপসরণ। তিনিই সব, তাঁহারই রাজ্য। তাঁহারই ভক্ত কেশব, তাই কেশব আদরের; তাঁহারই এই সংসার, তাই সংসার আদরের। হরিকে বাদ দিয়া যে জন কেশবের দিকে চাহিবে. সে প্রতারিত হইবে, প্রকৃত কেশবচরিত্র সে দেখিতে পাইবে না। হরির ভিতর দিয়া না চাহিয়া অন্য দিক দিয়া যাঁহারা কেশবের সহিত পরিচিত হইবেন, তাঁহারা হয় কেশবকে হরিজ্ঞানে পূজা করিবেন, না হয় পশুর ন্যায় অবহেলার চক্ষে দেখিবেন। হরির ভিতর দিয়া যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহারাই হরিভক্ত কেশবকে উপযুক্তরূপে চিনিতে পারিবেন; তাঁহারা তাঁহার নিকট শিখিবার অনেক জিনিস পাইবেন বটে, কিন্তু কখনও ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবেন না। দীনবন্ধু দয়াল হরি, এই করুন, আমরা তাঁহার ভিতর দিয়া তাঁহার ভক্ত সন্তানের প্রকৃত জীবন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃতার্থ হই। কেশবের মৃত্যু-স্মরণে জগৎ নূতন শিক্ষা লাভ করুক।

# মহাতীর্থ দর্শন।

পূর্ব্বে ছিল এই কথা,—তীর্থ হইতেও যাত্রী দেশে ফিরিয়া আসিয়া থাকে; এখন শুনা যাইতেছে, আর একটী নূতন কথা—যাহার তীর্থদর্শন হয়, সে আর স্বশরীরে ফিরিয়া দেশে আগমন করে না। পূর্ব্বে যে, তীর্থ দর্শনপিপাসু মানবগণকে ভালবাসার কোল দিয়া বিদায় করিয়া দিত—শত্রুরাও মিত্রতা করিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে তীর্থার্থীকে আহ্বান করিয়া ভোজনাদি করাইত, তাহার প্রকৃত কারণ এই, মনে মনে সকলের ধারণা থাকিত, আবার কিয়দ্দিবস পরে, তীর্থার্থী ফিরিয়া আসিলে ষোল আনা ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে। রেলগাড়ী হইবার পূর্ব্বে পথকষ্টে, কখনও বা রোগে, কোন কোন যাত্রীর প্রাণবিয়োগ হইত, সেই জন্যে কেহ কেহ বা বিদায়ের কালে, বিপদ কল্পনা করিয়া একটু আধটুক চক্ষের জলও ফেলিত, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা,—এখন রেল ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থান ছাইয়া ফেলিয়াছে; এখন আর ভয়

নাই, ভাবনা নাই,—তীর্থে যেমন যাওয়া, অমনি ফিরিয়া আসা। পূর্ব্বে, ভারতের ধর্ম্মযুগে, তীর্থ হইতে মানুষ ফিরিত, না একেবারে শরীরকে তীর্থে ভাসাইয়া দিত, সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট কোন জ্ঞান নাই। সে সময়ে লোক ফিরিত কি না ফিরিত, তাহা জানি না। আমাদের সময়ে, সেই ফুটন্ত বাল্যকালে দেখিয়াছি—তীর্থে লোক যাইতেছে, আবার আসিতেছে, কোন পরিবর্ত্তন নাই—কোন কিছুই নাই। আজ কাল একটী নূতন রাজ্যের একটী নূতন তীর্থের কথা শুনিতেছি। শুনিতেছি, সে তীর্থে যাইয়া যে দেব-দর্শন পায়, সে আর ফেরে না। যে গেল, সেই শরীর ভাসাইল। কোথায় সেই তীর্থ, সেখানে যাইতে সকলেরই অধিকার আছে কি না, সকলই বলিতেছি।

সংসার-ক্রীড়ালয়ে আমরা সকলেই এক একটী খেলা লইয়া রহিয়াছি। কেন খেলিতেছি, খেলার পরিণাম কি, কিছুই জানি না, শুধুই খেলিতেছি। খেলার উদ্দেশ্য ও পরিণাম জানিলে বোধ হয়, মানুষ এমনি করিয়া খেলিত না। রূপের বাজারে রূপ দেখিয়া মোহিত হইতেছি, জ্ঞানের বাজারে জ্ঞান বিকাশের অস্পষ্ট ছবিতে মুগ্ধ হইতেছি। কে শিখাইল, কেন শিখাইল, জানি না ; কিন্তু দেখিলাম, মায়ের কোল হইতে নামিয়া কেবলই ভালবাসিলাম। কে করিল, কেন করাইল, জানিনা, কিন্তু বড় হইয়া বুঝিলাম, পৃথিবীতে আসিয়া কেবলই শিখিলাম। পৃথিবী কত করিয়া শিখাইল। হৃদয়ে দুর্দ্দম্য ভালবাসার তেজ, মনে বাসনার দারুণ হুতাশন, মস্তিষ্কে বৈচিত্র্যময়ী জ্ঞান ক্রমেই যেন জ্বলিয়া উঠিল। মানুষ কি ছিল, কি হইল! প্রেম বল, পুণ্য বল, নীতি বল, ধর্ম্ম বল, জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল,শক্তি বল, শোভা বল,সকলই ক্রমে হৃদয়ে ধারণা হইল। কেমন করিয়া হইল ? তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি জানি, আমি বলি, একটু একটু করিয়া, ক্রম অনুসারে ধারণা হইল। বুদ্ধি একটু একটু করিয়া বিকাশ পাইল, মস্তিষ্ক একটু একটু করিয়া বড় হইল। হৃদয় একটু করিয়া বিস্তৃত হইল। অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান বুঝিয়া পরে ক্ষুদ্র শক্তিতে, ক্ষুদ্র প্রেমে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে অবতীর্ণ হইয়াছ ?—হইতে পার?—না—তা কখনই পার না। কেন, তা বলিতেছি। ক্ষুদ্রত্বেই আমাদের আরম্ভ—বালুকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া মানুষ জন্মিয়াছিল। সেই মানুষ কালে বড় হইল, কালে আরো বড় হইবে। জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল না, এখন একটু হইয়াছে, পরে আরো হইবে। শক্তি, তেজ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, প্রেম পুণ্য, একদিন এ সকলের অঙ্কুর ভিন্ন আর কিছুই ছিল

না। ক্রমে একটু পাইতেছি, কালে আরো পাইব। জরায়ু গর্ভে যখন ছিলাম, তখন হইতে এখন বড় হইয়াছি, অনন্ত জীবনে আরো কত বড় হইব। তখন যাহা বুঝিতাম না, এখন তাহা বুঝি, আবার এখন যাহা বুঝি না, অনন্ত কালের পথে হাটিয়া তাহা বুঝিব। তুমি বল, তখন যাহা, এখনও তাহা, অনন্ত কালেও তাহাই ?—ভুল কথা—কল্পনার কথা। তুমি বল, তখনও অনন্তের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্রত্বে অবতরণ করা যায়, এখনও যায়, পরেও যায়, এ অসম্ভব কথা। ঐ যে জ্ঞানের বিকাশ, ঐ যে শরীরের বিকাশ, এ সকলই ক্রমের অধীন। প্রথমে একটু, পরে অনেক। লোক যখন অনেক পায়, তখন একটুতে আর ফেরে না, তখন একটু আর চায় না। একটু সুখ পাইলে আরো সুখ পাইতে, একটু জ্ঞান পাওয়ার পর আরো জ্ঞান পাইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু অনেক সুখ পাইয়া একটু সুখে, অনেক জ্ঞান পাইয়া ক্ষুদ্র জ্ঞানে আসিতে কে সম্মত হয়? এই জন্যই দেখি, বালকের যৌবনে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা হয়, শিশুত্বে নহে; যুবকের বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে সাধ, বালকত্বে নহে; অতি বৃদ্ধের মরণে সাধ, জীবনধারণে নহে। বালকের জ্ঞান, বালকের শক্তি, বালকের প্রেম লইয়া কে কবে অনন্তকাল থাকিতে বাসনা করিয়াছে?—অনন্তের দিকে অবিরত মানব প্রাণ ছুটিয়াছে—বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই। ভিতর গমন, বাহির গমনের অর্থ বুঝি না—কেবল এই বুঝি, এই সংসারেই থাকিতে হইবে—অনন্ততীর্থের পথে হাঁটিবার জন্য। এই শরীর, এই হস্ত, এই পদ, এই ইন্দ্রিয় সকল, ঐ আকাশ, এই পাতাল, ঐ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র, এই পৃথিবী—এই জল বায়ু, এই সকলের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। কোথায়?—ঐ অনন্ত মহাতীর্থে। মানবজগৎ বুঝুক্ বা না বুঝুক্, অবিরত সকলে এই মহাতীর্থের দিকেই ছুটিতেছে। পাখী কলকণ্ঠ বাজাইয়া গান গায়, ফুল হাসিয়া হাসিয়া অধীর হয়; মেঘ ঝরে, বায়ু প্রবাহিত হয়, পৃথিবী নাচে, আকাশ হাসে,—যাত্রীদিগকে কেবল ঐ মহাতীর্থে আহ্বান করিবার জন্য। চাহিয়া দেখ, এ রাজ্যে কত দালাল পথিকদিগকে তোষিতেছে; দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে কত সুখই দিতেছে। সুখ দিতেছে, কিন্তু তৃষ্ণা মিটিতেছে না, আরো যাইতে ইচ্ছা হইতেছে, মানুষ আরো যাইতেছে। মানুষ, তুমি কোথায় পলায়ন করিবে?—পৃথিবীতে বা আকাশে এখন স্থান নাই, যেখানে এই দালালের দল বিদ্যমান নাই। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতেছ, মানুষ, সংসারকে ভুলিবার জন্য?

—অসম্ভব, তাহা পারিবে না। ইন্দ্রিয় থাকিবে, সংসার থাকিবে, তবে মহাতীর্থে যাওয়া যাইবে। এই সকল দালালেরাই পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। এই যে মহাতীর্থের উদ্দেশ্যে মানব ছুটিতেছে—বাধা নাই, বিশ্রাম নাই, অবিরত ছুটিতেছে; কাহার ভাগ্যে কতদিন পরে দেবদর্শন—মহাতীর্থ দর্শন হইবে, জানি না। কেহ দশ বৎসর, কেহ পঞ্চাশ বৎসর, কেবলই হাঁটিতেছে, অথচ তীর্থ মিলিতেছে না, তীর্থের ধারেও পৌঁছিতে পারিতেছে না। কত রোগ, কত শোক, কত জ্বালা, কত যন্ত্রণা, কত মায়া, কত মোহ, কত পাপ, কত তাপ আসিয়া পথিকদিগকে অধীনত্ব স্বীকার করাইয়া খাটাইয়া লইতেছে। যে এক বৎসরে যাইত, তাহার দশ বৎসর লাগিতেছে, যে দশ বৎসরে যাইত, তাহার পঞ্চাশ বৎসর লাগিতেছে—কাহারও বা স্বশরীরে আর তীর্থদর্শন হইতেছে না—দালাল সকল পলাইয়া যাইতেছে, তীর্থের স্বামী যাত্রিদিগের বিপদ দেখিয়া টানিয়া কোন্ অদৃশ্য স্থানে লইয়া যাইতেছেন। যত দিনেই হউক, তীর্থ মিলিবেই মিলিবে, এই আশ্বাসে যাত্রীদল তবুও অবিরত চলিতেছে। চলিতেই হইবে, কারণ অনন্ত বিশ্রাম, অনন্ত পথ-ভুলা রোগ নাই। সংসার-সরাইখানায় বসিয়া সময়ে সময়ে ক্লান্তি দূর করিতেছে, আবার হাঁটিতেছে। এই যে যাত্রীকের দল মহাতীর্থান্বেষণে চলিতেছে, ইহাদিগকে কেহই চিরকালের জন্য ফিরাইয়া আনিতে পারে না—মহাতীর্থ না দেখিয়া আর ইহারা ফিরিবে না। আমরা সকলেই যাত্রা করিয়াছি, চলিতেছি। মাতার ভালবাসার ক্রোড় কতক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে—বাল্যসহচরেরা কতক দূর—এখন সংসারে কত কত দালাল জুটিয়া লইয়া যাইতেছে। সংসারের লোকেরা বলে, তীর্থদর্শন হইলে আবার মনুষ্যসন্তান ফিরিবে। সংসারের লোকেরা বলে, পদ্মপলাশলোচন হরির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধ্রুব আবার সংসারে আসিয়াছিল। এ সকল ভুল কথা। হরির সাক্ষাৎলাভ করিয়া পূর্ব্বের সে ধ্রুব ফেরে নাই। কি অসার তর্ক করিতে আসিতেছ, কুতার্কিক দূর হও, তীর্থে যাইয়া যে মানুষ দর্শন পায়, সে মানুষ আবার ফিরিতে পারে? অসম্ভব কথা। যে তীর্থে যাইয়া মানুষ আবার পুরাতন তনু লইয়া ফিরিয়া আইসে, সে সংসারের ধূলির তীর্থ, পাপের খেলা, কুসংস্কারের লীলাক্ষেত্র, তাহার কথা এখানে তুলিও না। যে তীর্থের কথা বলিতেছি, সে মহাতীর্থ দর্শন হইলে, পুরাতন তনু নূতন হইয়া যায়—পুরাতন সকলই চলিয়া যায়। মহাতীর্থ কি? অনন্ত প্রেম-

বন্যা সেখানে প্রবাহিত, অনন্ত জ্ঞান অবিরত ছুটিতেতে, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত শান্তি—অনন্ত সুধা কেবলই সেখানে। সকল মিলিত হইয়া এক মহাযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছে। সে যজ্ঞের প্রজ্বলিত হুতাশনে, পাপ, লোভ, কাম, ক্রোধ, অশান্তি, অধর্ম্ম, মলিনতা, অপ্রেম, কুজ্ঞান সকল ভস্মীভূত হইতেছে। মহা তীর্থে দলে দলে যাত্রী সকল যাইয়া উপস্থিত হইতেছে, অমনি পরিবর্ত্তন হইতেছে। গেল মাটী লইয়া, হইল সোণা;—আর পূর্ব্বের সে বেশ নাই, আর সে ভূষা নাই, আর সে কিছুই নাই। সংসারের ধূলির মলিন দুর্গন্ধযুক্ত বসন ভূষণ সেই আগুনের সংস্পর্শ মাত্র দগ্ধ হইয়া গেল। সনাতনী তনু পাইয়া সকলে নাচিল, সকলে গাইল। অনন্ত প্রেমের ছবি, অনন্ত জ্ঞানের ছবি দেখিতে দেখিতে মানুষ অবাক হইয়া কেবলই ধ্যানে মননে প্রবৃত্ত হইল। সে দৃশ্য বর্ণনা করিতেই বা কে পারে, সে কীর্ত্তি বিঘোষিত করাই বা কাহার সাধ্যে ঘটে! তীর্থদর্শন করিয়া মানুষ কোথায় গেল?—সংসারে ফিরিল?—সে মানুষ আর সংসারের ধার ধারিল না। জীর্ণ, মলিন শরীর যখন সনাতনী তনু পাইল, তখন আর সংসারে, এই আমরা যে সংসারে আছি, এ সংসারে আর সে ফিরিল না। সে এমন রাজ্যে গেল—যেখানে পুরাতন বাতাস বয় না, পুরাতন চন্দ্র হাসে না, পুরাতন নদী চলে না, পুরাতন জীব বাস করে না। সেই রাজ্যে গেল, যেখানে মহাতীর্থাধিপতির ক্রীড়ার ভূমি, তাঁহারই রাজ্য। সেই রাজ্যে গেল—যে রাজ্যে চন্দ্র সূর্য্য তাঁহারই জ্যোতি ঘোষণা করে, নদী তাঁহারই মহিমা কুল কুল করিয়া প্রচার করে, পশু পক্ষী তাঁহারই কথা বলে। সেই মানুষেরও আর সেই পূর্ব্বের চোক নাই, সেই কাণ নাই, সেই হাত নাই, সেই পা নাই, সেই শরীর নাই, সেই মন নাই, সেই জ্ঞান নাই, সেই হৃদয় নাই; সেই রাজ্যে যাইয়া যাত্রী মানুষকে আর দেখে না, পশু পক্ষী আর দেখে না, চন্দ্র সূর্য্য আর দেখে না, আকাশ পাতাল আর দেখে না, দেখে এক শক্তি-সিন্ধু খেলিতেছে, তাহা হইতে অগণ্য, বিচিত্র ঢেউ উঠিতেছে। দেখে, কেবলই তীর্থাধিপতির বৈচিত্র্যময়ী ভাব সর্ব্বত্র বিরাজিত,—কেবল অনন্ত পুণ্য, শান্তি,পবিত্রতা প্রবাহিত। রিপু সেখানে বিলাসের কথা বলে না, ইন্দ্রিয় সেখানে প্রলোভনের টানে ভুলে না। সেখানে একই রূপ—সচ্চিতানন্দ-ঘন। দেখে কেবলই তাঁহার মহিমা, তাঁহার করুণা, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার বিজ্ঞান। সব যেন তখন তন্ময় হইয়া গিয়াছে। দেখে মানুষ আর মানুষ নয়,

পৃথিবী আর পৃথিবী নয় ;—মানুষ দেবতা, পৃথিবী স্বর্গ, মানুষ আর ক্ষুদ্র নয়, চন্দ্র ও আর ক্ষুদ্র নয়, সকল তখন অনন্ত কণা বলিয়া বোধ হয়। বোধ হয়,— সকল অনন্ত সিন্ধুর বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র, তাহাতেই উঠিতেছে, তাহাতেই রহিয়াছে, তাহাতেই মজিতেছে। তখন আর ক্ষুদ্রত্ব বোধ থাকে না, সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ভাব থাকে না,—সব একাকার—কেবলই অনন্ত। আমি তুমি, ছোট বড়, আপন পর, শত্রু মিত্র, স্ত্রী পুরুষ, পশু পক্ষী, লতা পাতা, মাটী সোণা, এ সকল ভেদজ্ঞান আর থাকে না। ভেদাভেদ নাই—একই জ্ঞান, একই ধ্যান। মাটী সোণা, বিষ্ঠা চন্দন, স্ত্রী পুরুষ এক হইয়া যায়। কে ছোট, কে বড়, কোন্‌টা ভাল, কোনটা মন্দ, কোন্‌টা রাখ্য, কোন্‌টা পরিত্যজ্য, এ জ্ঞান আর নাই—সকলই তাঁহার, সকলই তখন আদরের বোধ হয়। ক্ষুদ্রত্ব তখন অনন্ত হয়, সীমা তখন অসীম হয়, কূল তখন অকূল হয়। অকূলে পড়িয়া মানুষ তখন হাবুডুবু খায়। সে যে কি সুখ পায়, তাহা সেই জানে। আমরা তাহা বুঝিতে, ধারণা করিতেও অক্ষম। সেই দিন কবে আসিবে, যে দিন আমরাও অকূলের-কূল মহাতীর্থ দর্শন করিয়া এমনি করিয়া হাবুডুবু খাইতে পারিব।

# জাতীয় আন্দোলন।

"He (Joseph Mazzini) was of those who recognise no law but that of conscience, and recur for aid to none but God."
Memoir.

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ের আন্দোলনের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত এই আন্দোলনের ভিতরে ভারতের ভাবী উন্নতির জীবনী-শক্তির বিকাশ-প্রাপ্ত অঙ্কুরের পরিচয় পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন ; আবার কোন কোন পণ্ডিত এই বাহ্য-বিকাশ-প্রাপ্ত হৃদয়-শূন্য আন্দোলনে হৃদয়ে ঘোরতর যাতনা অনুভব করিতেছেন, এবং সময়ে সময়ে হৃদয়ের বেদনা জলদ গম্ভীর স্বরে জগতের নিকট প্রচার করিতেছেন। জীবনশূন্য আন্দোলন বায়ু-প্রক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়া যায়, আর জীবন্ত জাতীয় আন্দোলন দেশকে স্বর্গ করিয়া দেয়। আন্দোলন—ঘাত প্রতিঘাত ভিন্ন

মানুষ মানুষ হয় না। আন্দোলন জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। প্রথম সোপান গাঁথিবার সময়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। ভারতে আন্দোলন উঠিয়াছে, সুখের কথা। কিন্তু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে পরিণামে ইহাতে কুফল ফলিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আন্দোলন সাময়িক হুজুগে পর্য্যবসিত হইলে মঙ্গলের আশা থাকে না। সেই আন্দোলন চাই, যাহাতে হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়।

আমরা পরাজিত জাতি হই, আর যাহাই হই, আমাদের রাজা ইংরাজ; সেই সমুদ্র-বেষ্টিত ব্রিটেনিয়ার রাণী ভারতের ভাগ্যদেবী,—বলে, ছলে, বা কৌশলে ইংলণ্ডের প্রতাপের বিজয়ভেরী ভারত-চিদাকাশে আজ নিনাদিত—গম্ভীর স্বরে, অতি গম্ভীরে। ইংলণ্ডের রাণী আজ ভারতেশ্বরী। এই জন্য কেহ মনে করিবেন না, ভারতেশ্বরীই ইংলণ্ডেশ্বরী। ভারতেশ্বরী ভারতের সাম্রাজ্ঞী—ভারতের রক্ষাকর্ত্রী—পালয়িত্রী—ধ্বংসকর্ত্রী; ইংলণ্ডেশ্বরীর অন্য অর্থ, প্রজার সমবেত শক্তির ঘনীভূত সমষ্টি বা মিলন। একই জিনিস দুই প্রদেশে দুই রকম—এক দেশে প্রজা-শাসক বা প্রজা-নাশক; আর এক দেশে প্রজার দ্বারা শাসিত বা রক্ষিত। এক দেশে একই শক্তি অতুল মহিমান্বিত—প্রতাপান্বিত—সকলের উপরে উন্নীত, আর এক দেশে সকলের নিম্নে—সকল প্রজার সমবেত শক্তিতে রক্ষিত বা জীবিত। এক দেশে রাজ্ঞী আপনিই ক্ষমতা বিস্তার করিতেছেন, আর এক দেশে রাজ্ঞীর দ্বারা প্রজা সমষ্টি ক্ষমতা বা প্রভুতা বিস্তার করিতেছে। এক দেশে রাজ্ঞী প্রজার আশ্রয়, আর এক দেশে রাজ্ঞী স্বয়ং প্রজার আশ্রিত। ইংলণ্ডের কোটী কণ্ঠ, কোটী হৃদয় মিলিত হইলে আজ ইংলণ্ডেশ্বরীর সিংহাসন পৃথিবীর চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে পারে, আর এক দেশে মিলিত কোটী কণ্ঠকে, কোটী হৃদয়কে সাম্রাজ্ঞী মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূতে বিলীন করিতে পারেন। সংক্ষেপে, এক দেশে রাজার হাসিতে প্রজা হাসে, অন্য দেশে প্রজার হাসিতে রাজা হাসে। এমনি অবস্থা। ভারত আর ইংলণ্ডকে যাঁহারা এক চক্ষে দেখেন, আমাদের মতে তাঁহারা দৃষ্টিশক্তি থাকিতে অন্ধ। এই দুই দেশের অবস্থা কেন পৃথক, এক কর্তৃত্বাধীন হইয়াও কেন ভিন্ন দশা-প্রাপ্ত, ইতিহাসের মূলে সে তত্ত্বের অনুসন্ধান না করিয়া, যাঁহারা কেবল ইংলণ্ডের আন্দোলন ভারতে আনিতে চাহিতেছেন,—তাঁহারা যে একদেশদর্শী, সে কথা আর ভাষায় ব্যক্ত না করিলেও চলে। ইংলণ্ড

আজ ইংলণ্ড, ভারত আজ ভারত। ভারতকে আজ উন্নত করিতে হইলে, যে সাধনায় ইংলণ্ড সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয়, ইংলণ্ডের সেই প্রকৃষ্ট সাধনার ছবি ভারতের সম্মুখে ধরা প্রয়োজন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হইয়া যাঁহারা ভারতে আগমন করেন, এই জন্য তাঁহাদিগের দায়িত্ব অতি মহৎ। তাঁহাদের স্বভাবের কালিমায় ভারতের অঙ্গ মলিন হইলে, সে মলিনতা বিধৌত করিবার আর উপায় নাই। আদর্শ-স্থানীয় শিক্ষা-গুরু মন্দ হইলে, ছাত্রের জীবন কলুষিত হইবেই। ইংরাজ চরিত্রের সামান্য ত্রুটিতে ভারতের মহা অনিষ্ট হইতে পারে, কারণ ইংলণ্ড ভারতের আদর্শস্থানে দণ্ডায়মান। আর একটী কথা, ইংরাজের চরিত্রের আদি অন্ত ভারতের সম্মুখে থাকে না, কারণ পাচ সাত বৎসর পরে সকলেই দেশে প্রতিগমন করেন। যে কয়েক দিন ভারতে ইঁহাদিগকে দেখা যায়, সে কয়েকদিন কেবলই যদি স্বভাবের কালিমাময় অংশ প্রকাশ পায়, তবে তাহাতে দেশের অপরিশোধ্য অপকার হয়। এই জন্য ইংরাজ-চরিত্রে দোষের কথা লইয়া সর্ব্বক্ষণই আলোচনার প্রয়োজন। তাহাতে ইংরাজগণ সতর্ক হয়—আমরাও সতর্ক হই। দোষ আর সংক্রামিত হইতে পারে না। কিন্তু আলোচনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্ব্বদাই সম্মুখে রাখা কর্ত্তব্য। আপনাকে ভুলিয়া—দেশকে ভুলিয়া বৃথা হুজুগে মত্ত হওয়া কখনই উচিত নহে। বিশেষতঃ নিজের চরিত্র, দায়িত্ব ও দেশের অবস্থা ভুলিলে কোন আন্দোলনেই ফলের আশা থাকে না। মানুষ ভিন্ন পশুর কথায় কে কাণ দেয়? বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে যে প্রকার আন্দোলন চলিতেছে, ভারতে কখনই তাহা চলিতে পারে না। ইংলণ্ডে যে শক্তি, যে বীর্য্য, যে জ্ঞান, যে বিজ্ঞান, যে দর্শন, যে কাব্য, যে জীবন, যে হৃদয়, যে বিক্রম, যে প্রভুতা, যে ধর্ম্ম, যে নীতি, যে ভারতে তাহা নাই, সে ভারত আজ ইংলণ্ডের সমান হইবে, কখনই তাহা সম্ভব নহে। এক জাতীয়ত্বের গুণে ভারতের সাম্রাজ্ঞী ইংলণ্ডের রাণীই রহিলেন, সাম্রাজ্ঞী হইতে পারিলেন না। কঠোর সাধনায় বহু শতাব্দী পরে ইংলণ্ড আজ যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, বিনা সাধনায়, বিনা চেষ্টায় ভারত তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মহত্ত্ব ছিল, বীর্য্য ছিল, শক্তি ছিল, জ্ঞান ছিল, ধর্ম্ম ছিল, চরিত্র ছিল, তাহাতে কাপুরুষ, দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ভারতের কি? যাহা ছিল, তাহা স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে; সে স্মৃতিতে অহঙ্কারী হইও না, অনুতপ্ত হও, সিংহের ঔরসে শৃগাল ভাবিয়া,

ব্যথিত হও। যে জাতিতে জনব্রাইটের ন্যায় শত শত মহাত্মা এই মুহূর্ত্তে জীবিত, সে জাতির সাধনের বল স্থির চিত্তে চিন্তা করিতেও আমাদের হৃদয় অসমর্থ। সামান্য মূর্খ কৃষক নিউটনের জ্ঞানকে ধারণা করিতেও পারে না। ইংলণ্ডের সকল মহত্ত্ব আজও ইংলণ্ডে, ভারতে তাহার অল্পই প্রতিরূপ আছে। সকলেই যদি ইংলণ্ডে রহিল, তবে কেবল জীবনহীন, শক্তিহীন আন্দোলনে ভারতের কি হইবে? আন্দোলনের পূর্ব্ব শক্তি অগ্রে সঞ্চয় করিতে হইবে,—অগ্রে মহত্ত্ব লাভ করিতে হইবে,—অগ্রে চরিত্র লাভ করিতে হইবে—অগ্রে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যে ব্যক্তি আন্দোলনে রত, তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁহার চরণধূলি মাথায় করি। কি করিলে মনুষ্যত্ব লাভ করা ভারতের ভাগ্যে সম্ভব হইবে, সে কথা পরে বলিব। এখণ এই মাত্র বলি—ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতে বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতি লইয়া যে আন্দোলন চলিয়াছে—উহা প্রকৃত আন্দোলন নহে, উহা নিন্দাপ্রচারনীতি,—এই জন্য কলুষিত, নিন্দিত, সভ্য সমাজের অনাদৃত। তোমাদের ঘরের দোষ বা ত্রুটি লইয়া আমি যখন আন্দোলন করিতেছি, সেই সময়ে আমার গৃহ যদি তদপেক্ষা অধিকতর নিন্দার জিনিস হয়, তবে আমার সে আন্দোলনকে তোমরা কি বলিবে যে আপনি দুর্দ্দমনীয় রিপুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, পশুর ন্যায়, কত সতীর সতীত্ব,—কার্য্যে এবং কল্পনায়, নষ্ট করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেছে না, সে কোকিলামুখের হৃদয়বিদারক কাহিনী লইয়া ওয়েবের বিরুদ্ধে আর কেমন করিয়া আপন স্বর তুলিবে? ইহা অসম্ভব। সে স্বর তুলিলেও তাহা হৃদয়ের স্বর নহে—তাহাতে শক্তি নাই, তাহাতে পদার্থ নাই। শক্তিহীন স্বর বায়ুতে মিলাইয়া যায়—মানব-হৃদয়ে তাহার কোন আধিপত্য নাই। আমার কর্ত্তব্য আমি করিব না, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করিতেছ না বলিয়া তোমাকে তিরস্কার করিব; এ কথার মূল শক্তিহীন, জীবন হীন। তোমার কর্ত্তব্যপালনের ক্ষমতা অধিক, সুতরাং তুমি কর্ত্তব্য পালন করিতেছ না বলিয়া অনেকের অপকার হইতেছে, এ কথা তাহার বলিবার কি অধিকার, যে আপনি কর্ত্তব্যপালনের শক্তি পাইয়াও কিছুই কর্ত্তব্যপালন করিতেছে না? আপনাকে সংশোধন করিতে কাহার অধিকার বা শক্তি নাই? আপন পরিবারকে উন্নত করিতেই বা কাহার অধিকার নাই? অথচ এই বিস্তৃত ভারতে আজ গণনা করত, কত জন জিতেন্দ্রিয়—কত জন চরিত্র

বান্ লোক আছেন!! সহরে যাও, নগরে যাও, পল্লীতে যাও, বাজারে যাও,—কোকিলামুখের ওয়েব-কাহিনীর ন্যায় জঘন্য ঘটনা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক স্থানে ঘটিতেছে। একের ভাল অন্যের চক্ষে সয় না—এক জন অন্যকে অপদস্থ করিবার জন্য কত মিথ্যা নিন্দা প্রচার করিতেছে—এক জন আর এক জনের বুকে ছুরী হানিতেছে,—কত জাল, কত জুয়াচুরি, কত বদমায়েসী, কত ভ্রূণহত্যা! কত ব্যভিচার—কত নরক ভারতের বায়ুকে কলুষিত করিতেছে, এক বার স্মরণ কর! যে দেশে কলুষিত চরিত্র পুরুষের অত্যাচারের ভয়ে কুলস্ত্রী ঘরের বাহির হইতে পারে না—ভয়ে জড়সড় হইয়া গৃহের কোণে সতীত্বধনকে অতি কষ্টে রক্ষা করে, সে দেশের লোক অন্য দেশের লোকের চরিত্রহীনতার নিন্দা অগ্রে প্রচার করিবে, না—অগ্রে দেশের লোকদিগকে চরিত্রবান্ করিতে চেষ্টা করিবে? অন্যের নিন্দা প্রচারে সুখ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মহত্ত্ব কি, পৌরুষত্ব কি? ওয়েব যে অপরাধে অপরাধী, ভারতের কোটী কোটী সন্তান সেই অপরাধে অপরাধী। যদি সংশোধনের কথা বলিতে চাও—অগ্রে এই কোটী সন্তানের সংশোধনের চেষ্টা করা কি উচিত নহে? আর যদি শাসনের কথা বল, তবে এই কোটী সন্তানের শাসন প্রণালী অগ্রে উদ্ভাবন কর না কেন? বর্ত্তমান সময়ে সকল আন্দোলন স্বদেশবাসীদিগকে লইয়া হওয়া উচিত। তুমি দেশের হিতৈষী, অগ্রে তুমি আপনাকে সংশোধন কর, পরে দেশকে সংশোধন করিও। আন্দোলন করিতে চাও—দেশের দোষ লইয়া আন্দোলন কর। ভিন্ন-দেশীয়ের দোষের কাহিনী প্রচার করিয়া কলুষিত দেশকে আরো নিরাশার সাগরে নিক্ষেপ করিও না। মহত্ত্ব স্মরণে আত্মা উন্নত হয়, দোষ স্মরণে আত্মা অবনত হয়। ইংরাজের পশুত্ব স্মরণে ভারত কখনও উন্নত হইবেনা; হয় ত, দেবত্ব স্মরণে হইবে। দেবত্ব স্মরণে মানুষ দেবতা হয়। ইংরেজের পশু ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা থাকুক, মহত্ত্বকে কোল পাতিয়া লও। যদি কেবলই পশুত্ব দেখ, তবে অগ্রে তুমি মানুষ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে কথা বল! অন্ধ অন্ধকে চালাইতে পারে না। ভারতে যদি আদর্শ না পাও, বিদেশের ম্যাট্‌সিনিকে স্মরণ কর, ব্রাইটকে স্মরণ কর,—মানুষের উচ্চ আদর্শ পতিত দেশের ঘরে ঘরে ধরিয়া দেখাও, আমরা কি, আর ইঁহারা কি! মানুষ দেবত্ব লাভে সমর্থ, এই কথা প্রচার কর। ইংরাজকে চরিত্রহীন দেখিলে হৃদয় বিষাদে মলিন হউক,

সমবেদনার সমরানল গৃহে গৃহে জ্বলিয়া উঠুক, অত্যাচার নিবারণের মঙ্গলময়ী শক্তি হৃদয়ে তবে ত সঞ্চিত হইবে! তবে ত হৃদয়ে হৃদয়ে, কণ্ঠে কণ্ঠে সেই শক্তিস্ফুলিঙ্গ দীপ্তি পাইবে। আমরা দেবতা হইব, এই প্রতিজ্ঞার রোল গৃহভেদ করিয়া ভারত-আকাশকে পূর্ণ করুক। আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিলে অন্যের পশুত্ব অনায়াসেই সংশোধন করিতে পারিব। আজ যে আমাদের কথায় কাজ হয় না, ইহার কারণ, আমরা চরিত্রহীন, একতাবিহীন, নির্জ্জীব জাতি; নচেৎ কে প্রতিবাদকে অবহেলা করিতে পারে? পরীক্ষায় শিক্ষা লাভ কর, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিলে কেহ আর ভারতের কথায় কর্ণপাত করিবে না। আমরা আপনারা মানুষ হইলে অত্যাচার যে অনেক কমিয়া যাইতে পারে, ইহার দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথমত,—শুনা যায়, সাহেবেরা মফঃস্বলের হাকিমি পাইয়া যদৃচ্ছাক্রমে লোকের প্রতি অত্যাচার করে! অত্যাচার করে!—কারণ, আমরা পশু, আমরা অত্যাচারের উপযুক্ত কর্ত্তিত ক্ষেত্র যদি না হইতাম, তবে অত্যাচার কেমন করিয়া করিত? অত্যাচার করে, কারণ আমরা একতাবিহীন, নীতিবিহীন, সুতরাং দুর্ব্বল,—অধীনতা স্বীকার করিয়া করিয়া আমাদের রক্তমাংস জড়ের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। নচেৎ সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখেএকজন সাহেব সতীর সতীত্ব নষ্ট করে, বা কাহারও শরীরে বেত্রাঘাত করে—ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, এ কথা সংবাদপত্রের স্তম্ভে পড়িতে হইত না। সংবাদ-পত্রে সে সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, মানব সমষ্টির সমবেত বিবেক আততায়ীর মস্তকে লগুড় মারিয়া অত্যাচারের প্রতিবিধান করিত। একজন সাহেব যে স্থানে, সহস্র জন স্বদেশী সে স্থানে; অথচ শুনা যায়, সাহেবেরা অত্যাচার করে!!—দোষ স্বদেশবাসীর—না দোষ সাহেবের?—সংবাদ-পত্রে সাহেবের অত্যাচারের ক্রন্দন-কাহিনী শুনিতে আর ইচ্ছা করে না!

দ্বিতীয়ত,—অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজ বাণিজ্য করিবার ছলনে ভারতের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ভারতকে ঘোরতর দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। এ কথায় অনেক সত্য আছে—ভারত যে আজ শূন্যগর্ভ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু দোষ কাহার? একবার চিন্তা কর। সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়ী। দুটী ফুল এক রকম নয়, দুটী বৃক্ষ এক রকম নয়, দুটী নক্ষত্র এক রকম নয়; দুটী পক্ষী, দুটী পুরুষ, দুটী স্ত্রী এক রকম নয়। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী—পৃথিবীতে

কোটী কোটী সৃষ্ট বস্তু সকলই পৃথক পৃথক! কেন পৃথক পৃথক! কেন পৃথক পৃথক হইল? দুটী কারণ; একটী কারণ,—স্রষ্টার স্বরূপের পূর্ণবিকাশ বৈচিত্রময়ী প্রকৃতিতে প্রতিফলিত, এক একটী বস্তু তাঁহার এক একটী ভাবে প্রকাশ করিতেছে। আর একটী কারণ— পত্যেকে প্রত্যেকের মহত্ত্ব বুঝিবে, প্রত্যেকের বিশেষত্ব গ্রহণ করিবে,—প্রত্যেকে বিশ্বজনীন প্রেমে আবদ্ধ হইবে। তুমি ও আমি যে পৃথক, ইহার এক কারণ, বিশ্বজননীর এক ভাব তুমি প্রকাশ করিতেছ আর এক ভাব আমি প্রকাশ করিতেছি! আর একটী কারণ তুমিও আমার নিকটে শিক্ষার কিছু পাইবে, আমিও তোমার নিকটে কিছু পাইব; সুতরাং তোমাকে ও আমাকে মিলিতেই হইবে—আদান প্রদান করিতেই হইবে—পরস্পরকে পরস্পরে উপকারী বন্ধু জানিয়া ভালবাসিতেই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু, প্রত্যেক পরমাণু বিশেষত্বে পরিপূর্ণ! কাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কাহাকে রাখিবে?—সকলেই মঙ্গলময় শিক্ষা-গুরু হইয়া যেন বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রদানের জন্য জগতকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। ফলকে ভালবাসিবে, ফুলকেও আদর করিবে, চন্দ্রকে ভালবাসিবে, সূর্য্যকেও আদর করিবে,—কারণ, সকলের নিকটেই বৈচিত্রময়ী বিশেষত্ব শিক্ষার জন্য রহিয়াছে। সুখেও শিক্ষা, দুঃখেও শিক্ষা, সম্পদেও শিক্ষা, বিপদেও শিক্ষা। দুঃখে যাহা শিখি, সুখে তাহা শিখি না; সুখে যাহা শিখি, দুঃখে তাহা পাই না। সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য এই, প্রত্যেক অণু প্রত্যেক পরমাণুর বিশেষত্ব লইবে, সকলে সকলকে ভালবাসিবে—সকলে সকলের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিবে;—যাহা গ্রহণ করিবার, তাহা গ্রহণ করিবে। এই সংসার, মঙ্গলময় উদারতার রাজ্য,—ঘৃণা বিদ্বেষের রাজ্য নহে। এখানে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ একই পদবীতে উপবিষ্ট—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী সকলেই সকলের শিক্ষা-গুরু। জগতের বিশেষ ভাব এই—যাহা দিবার দেও; যাহা নিবার, তাহা নেও। যদি মানুষ হও, জগতের প্রত্যেকের বিশেষত্ব গ্রহণ কর, নচেৎ তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে। ভারতকে সম্পূর্ণ করিয়া বিধাতা সৃষ্টি করেন নাই,—ইংলণ্ডকেও করেন নাই। আমেরিকা, আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা—বিধাতার চারি প্রদেশ চারি প্রকার। এই চারি দেশই বিশেষত্বে পূর্ণ—বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, সাগর, প্রান্তর—পশু, পক্ষী, নর, নারী, এই চারি প্রদেশের এক প্রকার নহে;—কত বিশেষত্বে, কত বৈচিত্র্য

পূর্ণ। বিধাতা যেন বলিতেছেন—আমেরিকা আসিয়ায় যাও, ইউরোপ আফ্রিকায় যাও, আফ্রিকা আমেরিকায় যাও, আসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় যাও। সেই আদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া পৃথিবীর কত মনুষ্য, স্বজন পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, কত সাগর, কত পর্ব্বত পার হইয়া দেশ বিদেশে যাইতেছে—কত ভাব গ্রহণ করিতেছে—কত ধন রত্ন লাভ করিয়া বড় মানুষ হইয়া দেশে ফিরিতেছে। পৃথিবী, এই প্রকার পরস্পরের বিশেষত্ব শিক্ষা করিয়া, আজ জ্ঞানে, ধনে, মানে ও সভ্যতায় কত উন্নত হইয়াছে। ইংলণ্ড ভারতের বিশেষত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছে, বিশেষত্ব গ্রহণ করিতেছে—টাকা ত ছার জিনিস, কত মহামূল্য রত্ন লইয়া দেশে ফিরিতেছে; দেশকে শূন্য-গর্ভ করিতেছে। তাহাদের কর্ত্তব্য ত তাহারা করিতেছে, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য আমরা কি করিতেছি? তাহারা কত পাহাড় পর্ব্বত, সাগর উপসাগরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভারতের বিশেষত্ব লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমরা বিদ্বেষে জ্বলিতেছি, কিন্তু ইংলণ্ডের বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে আমাদিগকে কে নিষেধ করিয়াছে? ইংলণ্ড ভারতে আসিয়াছে, ভারত আজ ইংলণ্ডে গেল না কেন? ইংলণ্ড ভারতের রত্ন লইয়া গেল, ভারত কেন বিদেশের রত্ন আনিল না? স্বাধীন বাণিজ্যের দ্বার মুক্ত। ভারত দরিদ্র হইল, এই চীৎকার করিতেছ, ভাই, তুমি ভারতের ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য সাগর পার হইয়া ইংলণ্ডে, আমেরিকায় যাও না কেন? তাহা তুমি পার না, কারণ, জাতিভেদের পূজা তোমার হৃদয়ের বড় প্রিয় জিনিস!! ভারতের দারিদ্র্যের কারণ ইংরাজ নহে; ভারতের জাতিভেদ-প্রথা। দোষ ইংরাজের নহে, দোষ আমাদের। আমরা গোলামী করিব, তবুও বহির্বাণিজ্য করিব না। আমাদের কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য ভারতকে যে দারিদ্র্য-পীড়নে কাতর হইতে হইয়াছে, সে দোষ ইংরাজের মস্তকে চাপাইয়া দেওয়া কখনই উচিত নহে;—তাহাতে উদারতা নাই—বিশ্ব-প্রেমের ভাব নাই,—মনুষ্যত্বের চিহ্ন নাই। আমাদের দোষেই ভারত আজ দরিদ্র!

উপরে যে সকল কথা বলা হইল, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়,—অগ্রে আমাদিগকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে; স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত হইতে হইবে—জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল সাধনের জন্য রাজনীতির আন্দোলন ও সমাজনীতির আন্দোলন একই সময়ে হওয়া উচিত। কিন্তু এ দুই আন্দোলনের পূর্ব্বে ধর্ম্মান্দোলন একান্ত প্রার্থনীয়।

ধর্ম্মের কথা দূরে রাখিলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন মানুষকে মানুষ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস আছে, ধর্ম্ম না থাকিলেও সমাজ ও রাজা মনুষ্যকে সৎপথে রাখিতে পারে। বাস্তবিক কি এ কথা সত্য? সমাজ বা রাজা মানবের কোন্ স্থান দর্শনে সক্ষম?—বাহিরের কার্য্য ভিন্ন অন্তরের কিছুই সমাজ স্পর্শও করিতে পারে না—ভাল কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারে না, মন্দ কার্য্যের জন্যও তিরস্কার বা শাসন করিতে পারে না। মনুষ্যের মহত্ত্ব কোথায়?—তাহা অন্তরে, না বাহিরে?—এক জন লোক ভাল কার্য্য করিল, ঐ কার্য্যটী তাহার মহত্ত্ব নহে, মহত্ত্বের পরিচয় মাত্র; ঐ কার্য্যের যে ইচ্ছার অঙ্কুর হৃদয়ে জন্মিয়াছে, তাহাতেই তাহার মহত্ত্ব। এক জন লোক সৎকার্য্য করে নাই, কিন্তু হৃদয়ের গুপ্ত স্থানে সৎ-কার্য্যের ইচ্ছা ছিল, সেই লোক কি মহৎ নহে?—আবার আর এক দিক দেখ, ওয়েব ও আমি। ওয়েবের কার্য্য অতি দূষিত, আমিও যদি এই মুহূর্ত্তে পরস্ত্রীর প্রতি কুটিল নয়নের বিষময় দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি, যদি এখনই তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া থাকে, তবে আমি কি অসৎ, নরাধম, পাষণ্ড নহি? মানবের মহত্ত্বও হৃদয়ে, পশুত্বও হৃদয়ে;—দেবত্ব সৎ ইচ্ছায়, পশুত্ব অসৎ ইচ্ছায়। ইচ্ছাতেই এ রাজ্যের পরীক্ষা। অন্তরকে গরলময় করিয়া, বাহিরে সুধা মাখিয়া আমি যে বেড়াইতেছি—অন্যের চক্ষে ধূলি দিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া ভবের বাজারকে আমি যে প্রতিধ্বনিত করিতেছি, আমাকে তুমি কি ভাল বলিবে? অন্যের দ্রব্য দেখিলেই চুরি করিতে ইচ্ছা হয়, অন্যের ভাল অবস্থা দেখিলেই হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হয়, অন্য সতী দেখিলেই রিপুর উত্তেজনা আরম্ভ হয়, এমন যে লোক, সে মানবাকারে পশু। যাহার অন্তর গরলময়, এমন পশুর শাসন কে করিতে পারে? বাহিরের ঘটনা ভিন্ন রাজা বা সমাজ মনুষ্যকে শাসন করিতে পারে না। এই জন্যই বাহির-ঢাকা, বিষ-অন্তর কত জঘন্য লোক সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—পৃথিবীর অতি অল্প লোকের শাসনই সমাজ বা রাজা করিতে পারেন। এই জন্যই দেখা যায়, রাজার শাসন যতই তীক্ষ্ণ হয়, ততই গোপনে পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয়—যাহাতে ধরা না পড়ে তাহারই চেষ্টা হয়, অন্তরকে শোধন করিতে চেষ্টা হয় না। কারণ, হৃদয়ে যাহার পাপ-স্পৃহা বর্ত্তমান, সে কেমন করিয়া তাহাকে দমন করিবে? সে শক্তি কোথায়?

সে বল কে দেয়?—সে উপদেশই বা কোথায় পাওয়া যায়? এই জন্য দেখা যায়, রাজার শাসন তীক্ষ্ণ হইলেও দেশের পাপস্রোত নিবারিত হয় না;—বরং আইনের জটিলতা ও কঠোরতার সহিত পাপের স্রোতও প্রখরতর হইতে থাকে। রাজার শাসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানুষ যখন পাপস্রোতে প্লাবিত হইতে লাগিল, তখন সামাজিক শাসনও শিথিল হইয়া পড়িল। কারণ সমাজের সকলেই যখন একদশাগ্রস্ত হয়, তখন কে কাহাকে শাসন করিবে? শাসনের শক্তি তখন আর মানুষের থাকে না। দোষী পিতার শাসনকে বালক তখন উপেক্ষা করে, দোষী ভ্রাতার আজ্ঞাকে ভ্রাতা তখন লঙ্ঘন করে; এই প্রকারে সমাজ ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল দশায় উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতেও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামে যাও, নগরে যাও, পল্লীতে যাও,—রাস্তা, ঘাট, বাজার, যেখানে ইচ্ছা যাও, দেখিবে—মনুষ্যের ব্যবহারে আর মনুষ্যত্ব নাই—কেবলই পশুত্ব—ব্যভিচার, স্বেচ্ছাচার, অনাচার, কদাচারের স্রোত কেবলই চলিয়াছে। রাজা দোষীকে ধরিতে পারেন না—কারণ সাক্ষী জোটে না, সকলই মিথ্যা ও প্রতারণাময়। দোষী আদালতে মিথ্যা সাক্ষী ও ঘুষের জোরে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইতেছে। সমাজের সকল লোকই যখন পশুত্ব-প্রাপ্ত, তখন পুলিসই বল, আর বিচারালয়ই বল, এ সকল স্থানে আর সুবিচারের আশা থাকে না। মোকদ্দমার বিচার ভাল হয় না, জেলার এক জন ইংরাজ বিচারকের কেবল সে দোষ নহে,—দেশীয় সহস্র সহস্র লোকের। দেশীয় লোকের দোষে ধর্ম্মাধিকরণও বর্ত্তমান সময়ে অধর্ম্মের ক্রীড়াস্থল হইয়া উঠিয়াছে। ভিতরের পাপ ইচ্ছা ত কাহারও ধরিবার শক্তি নাই, বাহিরের বদমায়েসী ও জঘন্যতা এই প্রকারে সমাজ ও রাজার চক্ষুকে ফাকি দিতেছে! এক্ষণে দেশের আশা কোথায়? বাহ্য-আন্দোলনে কি কিছু ফলের আশা আছে? রাজনীতির আন্দোলন চাই, না প্রজানীতির আন্দোলন প্রয়োজন? বাহির শোধনের আন্দোলন করিবে—না ভিতর শোধনে হাত দিবে? যাঁহারা আন্দোলন করিবেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ ভিতর-শূন্য,—নীতিহীন। দুঃখের কথা বলিব কি, দেশের কোন কোন দেশহিতৈষী সংবাদপত্রের সম্পাদকের বাড়ী পর্য্যন্ত মদ ও বেশ্যায় পূর্ণ! আমি হাহাকার করিতেছি, তুমিও করিতেছ—কিন্তু আমরা উভয়েই ঐ দশাগ্রস্ত—কলুষিত হৃদয় লইয়া বাস করিতেছি। ইংরাজের দোষ দেখিতেছি, কিন্তু স্বদেশীয় দোষ দেখি-

তেছি না; আমার নিজের দোষের কথাও ভাবিতেছি না। এই কারণে আন্দোলনও একদেশদর্শী হইতেছে—বাহির দেখিয়া বাহির ধরিতে যাই-তেছে, হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, হৃদয়ের ভাব ধরিয়া টানিতে পারিতেছে না। হৃদয়কে স্পর্শ ক করিতে পারে? হৃদয়কে সংশোধনই বা কে করিতে সক্ষম? একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন এস্থানে আর সকল শক্তি পরাস্ত। হৃদয়কে বলীয়ান করিতে ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ নাই—সংস্কৃত করিতেও ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ নাই। দোষের বিচারক আছেন, পরকাল আছে, ইহকালই লক্ষ্য নহে—ইন্দ্রিয়াদি দুদিনের, পৃথিবীর সুখস্পৃহা দুদিনের, এ চিন্তা ভিন্ন মানুষ কখনও অন্তরকে পবিত্র রাখিতে পারে না। পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র সহবাস ভিন্ন মানুষ পবিত্র হইতে পারে না। বিবেকের স্পষ্ট আদেশ পালন ভিন্ন মানুষ সৎ পথে চলিতে পারে না। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্তরকে জীবন্ত করিতে, পবিত্র করিতে পৃথিবীতে আর কোন শক্তি নাই। এমন বল, এমন শক্তি আর কোথাও মিলে না। ধর্ম্মকে ভুলিয়া, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া, যে সমাজ চলিতে চাহে, সে সমাজ, এই কারণে, কখনও নির্দ্দোষ পুণ্য, শান্তি, পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বকালে ভারতে যে পবিত্রতা ছিল, সে কেবল ধর্ম্মভাব ছিল বলিয়া। সমাজ ও রাজার হৃদয় তখন ধর্ম্মে পূর্ণ ছিল। তখন দেশের লোক ধর্ম্মের অনাবিল পবিত্র শাসনে শাসিত ছিল। লোক ধর্ম্মের ভয়ে সৎ থাকিত, লোক ধর্ম্মের চিন্তায় তখন পবিত্র থাকিত। প্রজা ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া রাজাকে মানিত, রাজা ধর্ম্মের প্রতিনিধি বা অব-তারের ন্যায় প্রজার বিচার করিতেন। প্রজার ভালবাসা রাজা পাইতেন, রাজার সৎ ইচ্ছা প্রজার মঙ্গল করিত। মানবের অন্তরে অন্তরে তখন ধর্ম্মের মিল ছিল; ধর্ম্মরাজ্যের পালন ও শাসন তখন ধর্ম্মই করিত। ধার্ম্মিকের চক্ষু সহজে তখন দোষীকে ধরিতে পারিত; দোষী তখন ধার্ম্মিকের নিকটে আসিয়া ভয়ে কম্পিত হইত। যে গ্রামে একজন ধার্ম্মিক থাকিত, সে গ্রামের লোকের হৃদয় পাপ করিবার সময় কম্পিত হইয়া যাইত। সেই এক দিন ছিল, আর আজ এই এক দিন! আজ কথা উঠিতেছে, ধর্ম্ম ভিন্নও রাজ্যশাসন চলিতে পারে, সমাজ চলিতে পারে। ইংরাজ এই ধুয়া ধরিয়া যথেচ্ছা অত্যা-চার করিতেছে, উচ্ছৃঙ্খল ভারত সেই অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া হা-হতোস্মি করিতেছে। এটা নাকি স্বাধীনতার যুগ? বাস্তবিক ইহা স্বাধীনতার যুগ নহে, স্বেচ্ছাচারের যুগ—উচ্ছৃঙ্খল দশা প্রাপ্তির যুগ। আজ যে আন্দোলন

উঠিতেছে—ইহা যে জাতিভেদের আর এক মূর্ত্তি, তাহা কেহই ভাবিতেছেন না। যে দেশ জাতিভেদের অসংখ্য কষাঘাত-পীড়নে দুর্ব্বল, সেই দেশে ইংরাজকে এক অভিনব জাতিতে পৃথক করিবার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালির দোষ দোষ নহে, ইংরাজের সামান্য দোষও মহাদোষ, এই কথারই প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। দেশীয় জমীদার, দেশীয় ডেপুটী বাবু, উকীল বাবু, মোক্তার বাবু, মুন্সেফ বাবু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবের দল, শিক্ষা ও নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, যে সকল বীভৎস কাণ্ড করিতেছেন, তাহা কে দেখিবে, কে তাহার গণনা করিবে? তুমি সে কথা বলিতে যাও, তুমি দেশহিতৈষী নহ। ইংরাজের দোষ প্রচার কর, তবেই হইল!! হায়, মানুষ সার্ব্বভৌম ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া এত অন্ধতায়ও পরিণত হইতে পারে?—হায়, সোণার মানুষ উদারতার বিশ্ব-বিস্তৃত প্রেম পরিহার করিয়া এত সঙ্কীর্ণতায়ও পরিণত হইতে পারে!! এ আন্দোলন, এ ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত একদেশদর্শী ইংরাজের দোষ প্রচারে ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আমাদিগকে যাহা বলিতে ইচ্ছা কর, বল, আমরা যাহা সত্য বুঝিয়াছি, তাহা বলিবই বলিব। ভারতের এক্ষণও ইংলণ্ডের নিকট অনেক শিক্ষা করিতে হইবে—ইংলণ্ডের নিকট হইতে অনেক পাইতে হইবে। সামান্য সামান্য ব্যক্তিগত দোষের কথা ভুলিয়া ইংরাজ-শাসন-নীতি আলোচনা করিলে কি আমরা ইংরাজের উদারতা দেখিতে পাই না? সংসারে সৎ অসৎ, দুই বর্ত্তমান। মধুকরের ন্যায় ফুলের গণনা না করিয়া মধু সংগ্রহ করিতে হইবে। অসারাংশ বাদ দিয়া সর্ব্বস্থান হইতে সার গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরাজের মধ্যে এমন কিছু আছে, বাঙ্গালীর মধ্যে যাহা নাই। তাহাদের দোষ আছে, গুণ কি নাই? টম্‌সনের যে উদারতার নাই, রিপনের তাহা আছে,—জন ব্রাইটের তাহা আছে। স্বদেশকে মানি বলিয়াই বিদেশকে মানিতে হইবে, বিদেশের নিকট শিখিতে হইবে। স্বদেশও চাই, বিদেশও চাই। বিশেষতঃ বিদেশকে, এমন উদারভাবে, ইংলণ্ডের ন্যায় আর কোন রাজা শাসন করিতে পারে নাই; ইহা স্মরণ রাখিয়া, ইঁহাদের মহত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তার পর আমরা যাহাতে মানুষ হইতে পারি, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন তাহা কখনও হইবে না। ধর্ম্মকে সমাজনীতির রাজা করিয়া লইতে হইবে,—রাজনীতিকে প্রজানীতি করিতে হইবে। ধর্ম্মেই চরিত্র, ধর্ম্মেই বীর্য্য, ধর্ম্মেই একতা হইবে। ধর্ম্মেই পুণ্য, ধর্ম্মেই বল, ধর্ম্মেই নীতি সজ্ঞা।

রিত হইবে। ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রজার দল যখন ধর্ম্মবীর ম্যাট্‌সিনির ন্যায় বিবেকের আদেশ পালন করিতে উত্থিত হইবে,—তখন এমন কোন্ রাজা আছে, যাহার অধর্ম্মের সিংহাসন টলিবে না?—কোন্ ওয়েব্ আছে, পাপ কার্য্য করিয়া যে সমাজে দণ্ডিত না হইয়া বাস করিতে পারিবে? বিবেক যখন মানুষের রাজা হয়, তখনই মানুষ স্বাধীন হয়। বিবেকের কথা মতে যে চলে, কোন রাজার সে অধীন নহে। বিবেক যখন মানবরাজ্যের রাজসিংহাসন পাইবে, তখন দোষী ব্যক্তি সমাজে নিন্দিত, দণ্ডিত না হইয়াই পারিবে না। নিন্দিত হইয়া সে চরিত্র সংশোধন করিবে। পুণ্যময় শ্রীক্ষেত্রে আর তখন জাতিভেদ থাকিবে না। পরশমণির স্পর্শে মাটী তখন সোণা হইবে। চরিত্রের সংস্পর্শে বনের পশুরও চরিত্র ভাল হইবে। পুণ্যের সংস্পর্শে মানুষের পাপ চিন্তা তিরোহিত হইবে, ধর্ম্মের মিলনে অধর্ম্ম ভয়ে পলায়ন করিবে। ভারতে ধর্ম্মশূন্য রাজনীতির আন্দোলনের অর্থ আমরা বুঝি না—তাহাতে ভারতের সর্ব্বনাশ করিবে। রাজনীতি ও সমাজ-নীতির মূল ধর্ম্মনীতি—সেই নীতিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যদি ভারত ধর্ম্ম পায়, তবেই সকল পাইবে;—যদি বিবেকের কথা মত চলিতে পারে, তবেই স্বাধীন হইবে; যদি চরিত্র পায়, তবেই একতা সম্ভব হইবে। নচেৎ ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, বৈষম্য, অত্যাচার, ও অধীনতার যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, ইহা থামিবে না, ইহা থামিবার নহে। ভাই ভারতবাসি, কেবলই হুজুগ করিবে, একবার কি ভারতের মূল শক্তির সেবা করিবে না?—শক্তি সাধন কর—তবেই আন্দোলনে ফল পাইবে, তবেই স্বাধীনতা পাইবে। তবেই সমাজ স্বর্গ হইবে, তবেই ইংরাজ পরাস্ত হইবে,—দেশ পুণ্যক্ষেত্র হইবে।

# কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রেমাবতার বা ম্যাট্‌সিনি।

পণ্ডিতেরা বলেন, হৃদয়ের শক্তি পৃথিবীর সকল শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি। তাঁহারা বলেন, হৃদয়শক্তি পৃথিবীর মূলশক্তি, আর সকল শক্তি তাহারই ছায়া বা প্রতিকৃতি। হৃদয়শক্তির প্রাবল্যেই মানুষ দেবতা বা ঈশ্বরাবতার। হৃদয়শক্তির অপর নাম প্রেমশক্তি। এক প্রেমের বিকাশে আত্মায় পরমাত্মায় যোগ, আর এক প্রেমের বিকাশে জগতের নরনারী,

জীবজন্তু সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সহিত আত্মার ঘনিষ্ট যোগ। মানুষ কে?—ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, কীটাণুবৎ—দুর্ব্বল—শক্তিহীন। কোটী কোটী সৃষ্ট-পদার্থের একটী ক্ষুদ্র সৃষ্টি মানবসমাজ—সিন্ধুর একবিন্দু। এক একটী মনুষ্য আবার সেই বিন্দুর এক অংশ। বিন্দুরও পরিমাণ করা যায়, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র ভাবে এত ক্ষুদ্র যে, তাহার পরিমাণও হয় না। যখন অগণ্য চন্দ্রতারকাখচিত নভোমণ্ডলের দিকে তাকাই, আর তাকাই বিস্ময়-পূর্ণ বিচিত্র সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র এই পৃথিবীতলে, তখন মনে হয়, মানুষ কে যে, তাহাকে গণনা করিব?—মানুষ কোথায়?—বিন্দু তখন সৃষ্টিসিন্ধুতে বিলীন হইয়া যায়, তাহার পরিমাণও করা যায় না। পরমাণুকে বিভিন্ন করিতে করিতে শেষে এত সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয় যে, তাহাকে কল্পনাও করা যায় না। অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম—অতি সঙ্কীর্ণ মানুষকে বিভিন্ন অবস্থায় চিন্তা কর; বুঝিতে পারিবে—সৃষ্টির সহিত তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র। পরমাণু মিলিতে লাগিল,—মিলিতে মিলিতে পাহাড় হইল, পর্ব্বত হইল—নদ হইল, নদী হইল—সকল মিলিয়া সৃষ্টি-সিন্ধু উৎপন্ন হইল। ক্ষুদ্র মানব-পরমাণুও মিলিতে লাগিল, মিলিতে মিলিতে কত বড় মানব-সমাজ হইল। কত ক্ষুদ্র জিনিস কত বড় হই-য়াছে। কতই জ্ঞান, কতই বিজ্ঞান, কতই দর্শন, কতই কাব্য মানুষের মস্তক হইতে নির্গত হইতেছে। সমষ্টিতে মানুষ কত বড়। দশ জনের জ্ঞান আমার চতুর্দ্দিকে আছে বলিয়াই আমি এত শিখিতেছি—দশ জনের চিন্তা-স্রোত আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়াই, সেই স্রোত ধরিয়া চলি-তেছি। বংশ-পরম্পরার জ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম্মবল, চরিত্র-বল আমাকে পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া অগ্রসর করিতেছে বলিয়া, আজ এত উন্নত হইয়াছি। ক্রমে যে পৃথিবী উন্নত হইতেছে, সে এই জন্য, একের সাহায্য অপরে পাইয়াছে। সমষ্টির সমবেত শক্তি ভিন্ন মানুষ অতি ক্ষুদ্র—অতি অনুন্নত। যদি পৃথি-বীর কোন মানুষ কোন মানুষের জন্য না ভাবিত—কোন মানুষ মস্তক খাটাইয়া কোন মানুষের জন্য কিছুই জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া না রাখিত,—সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক, পারিবারিক বা পারলৌকিক কোন তত্ত্বই যদি না রাখিয়া যাইত, তবে পৃথিবী কখনই আজ এত উন্নত হইত না। একের বলে; অপরের বল, একের জ্ঞানে, অপরের জ্ঞান বৃদ্ধি। পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিতেই হইবে। গৃহেই থাক, আর গৃহের বাহিরেই হও—যদি

মানুষ হইতে চাও, পরস্পরের দান গ্রহণ করিতেই হইবে। উপেক্ষার রাজ্য এখানে নাই। মহাসিন্ধুর মহাবিন্দু পৃথক থাকিতে পারিবে না; মিলিবেই মিলিবে। মিলিতে মিলিতে, পাইতে পাইতে, লইতে লইতে পৃথিবী আজ কত উন্নতি লাভ করিয়াছে; জ্ঞান-গরিমায় কত বড় হইয়াছে। স্পেন্সর বিলাতে বসিয়া প্রদান করিতেছেন, আমি এখানে বসিয়া লইতেছি, কেশবচন্দ্র ভারতে বসিয়া জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন,—পৃথিবী তাহা লইতেছে ও লইবে। সকল মানব-পরমাণু মিলিয়া মিশিয়া এক মহাসিন্ধু, সেই সিন্ধুর নাম সমাজ। সমাজে যে আজ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ তুলিয়া বিচ্ছেদের আগুন জ্বালাইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা জানি; কিন্তু তাহা স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমাজ এক—অকূল সমুদ্র। খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ—সব মিলিয়া এক মহাসিন্ধু। সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার। ছোট বড়, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ—সব একাকার। আদান প্রদান চলিতেছে—প্রাণে প্রাণে বিনিময় হইতেছে—সাম্প্রদায়িকতার শক্তি পরাস্ত হইতেছে, এক মহাবাণীর দুর্জ্জয় নিনাদে সব মিলিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। বিন্দু উঠিতেছে—সিন্ধুতে মিশিতে। বুদ্‌ বুদ্‌ জন্মিতেছে—পৃথকত্ব নাশ করিয়া সিন্ধুতে মিলিতে। এক সূত্রে সকলে বাঁধা পড়িয়াছে। সত্যযুগে, কলিযুগে, দ্বাপরে, ত্রেতায় দুশ্ছেদ্য দৃঢ় বন্ধন। শতাব্দীতে শতাব্দী দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা। কালিদাস সেক্ষপিয়র, শঙ্করাচার্য্য আর বুদ্ধদেব, নিউটন আর গ্যারিবল্ডি, চৈতন্য আর যিশুখ্রীষ্ট, ম্যাট্‌সিনি আর পার্কার—সকলেই এক দুচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ—সেই শৃঙ্খল আবার বর্ত্তমান নরনারীকে অলক্ষিত ভাবে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। এই যে সূত্র, এই যে বন্ধন, ইহা মহাবন্ধন—মহামায়ার মহামায়া-বন্ধন। ইহারই অপর নাম প্রেম। প্রেমই প্রথম বন্ধন, জ্ঞান পরে। প্রেমে মিলিলাম—তবে জ্ঞান পাইলাম। জড়জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া মানুষ বিজ্ঞান পাইল, জীবজগৎকে আলিঙ্গন করিয়া দর্শন পাইল। প্রেম আদিতে ছিল, তাই আর সকল ঘটিল, আর সকল মিলিল। প্রেম মূলে ছিল—তাই সকলে পরস্পরের বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে পারিল—জ্ঞানী হইতে সক্ষম হইল। প্রেমে জগৎ বাঁধা ছিল বলিয়া বর্ত্তমান শতাব্দী অতীত শতাব্দীর অর্জ্জিত বস্তুর উত্তরাধিকারী হইল—পুত্র পিতার ঐশ্বর্য্য পাইল। ক্ষুদ্র মানুষ

এক প্রেমেতেই এত উচ্চ মনুষ্যত্বে আজ অধিষ্ঠিত। মানুষ প্রেমের অবতার—তাই মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব—জ্ঞানে বিজ্ঞানে, বিদ্যা বুদ্ধিতে আজ এত উন্নত। এই যে প্রেমের মহাসমুদ্র—অলক্ষিত—অথচ উজ্জ্বল,—ঢেউ-শূন্য, অথচ বিহ্বল; এই সমুদ্রে মানুষ পড়িয়া, মিলিয়া কেবলই পান করিতেছে। ক্ষুদ্র মানব-পরমাণু সকল একবার পান করিয়া পৃথক হইতেছে,—হইয়া আপন অস্তিত্ব জগতে প্রচার করিতেছে, আবার স্বাতন্ত্র্যকে সাগরে ডুবাইতেছে। একবার আমি আমিত্বে আসিতেছি, আবার তোমাতে ডুবিতেছি—জগতে ডুবিতেছি—কুল কিনারা ভুলিয়া অকূলে মিশিতেছি। সব পরমাণু পৃথক, আবার সব পরমাণু একাকার। একবার সকলে আদান প্রদানের জন্য মিলিতেছে, আবার সকলে পৃথক হইয়া পড়িতেছে। এই প্রকার মিলিতে মিলিতে, ডুবিতে ডুবিতে, পান করিতে করিতে, এক এক জন মহামায়ার মহা প্রেমে মত্ত হইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্র পরমাণু যেন সেই সিন্ধুতে একেবারে মিলিয়া যাইতেছে। আপনার অস্তিত্ব জগতের অস্তিত্বে মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের আপনার বলিবার আর কিছুই থাকিতেছে না—সমস্ত জগৎ তাঁহাদের আপনার হইয়া যাইতেছে—অথবা তাঁহারা জগতের হইয়া যাইতেছেন;—এমনই হইয়া যাইতেছেন যে, মানুষ দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেছে। তখন তাঁহাদের হৃদয়ে আর স্বার্থ নাই—কেবলই পরার্থ; সঙ্কীর্ণতা নাই—কেবলই উদারতা,—সীমা নাই—কেবলই অসীমতার লীলাখেলা দেখিয়া মানুষ চমকিত, বিস্মিত হইয়া যাইতেছে। মানুষ মানুষের সে অপরূপ দেখিয়া আর তাঁহাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না। মানুষের বুদ্ধি বিদ্যা পরাস্ত হইয়া যাইতেছে—চিন্তা ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইতেছে—অবাক হইয়া মানুষ মানুষদিগকে প্রেমের অবতার না বলিয়া ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। বুদ্ধদেব, নানক, চৈতন্য, যিশুখ্রীষ্ট এই জন্য আজ জগতে—ঈশ্বরাবতার। এই কারণেই আজ আবার কোন একদেশদর্শী বাঙ্গালার পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। অসীমে সীমাত্ব আছে, সিন্ধুতে বিন্দুত্ব আছে, কিন্তু সীমা ও বিন্দুতে অসীম সীমাপ্রাপ্ত,—সিন্ধু বিন্দু-প্রাপ্ত। বিন্দু বলিলে সিন্ধুকে বুঝায় না। বিন্দুতে সিন্ধুর অংশ আছে—থাকিতে পারে, কিন্তু বিন্দুই সিন্ধু নহে। এই কথাটী পৃথিবীর নরনারী বুঝিতে পারিল না। বৃক্ষে ঈশ্বর, ফলে ঈশ্বর, ফুলে ঈশ্বর,—জলে ঈশ্বর,

স্থলে ঈশ্বর আছেন, সত্য কথা; কিন্তু তাই বলিয়া ফুলকেই ঈশ্বর বলিলে ঈশ্বরের কিছুই বলা হইল না;—সিন্ধু সেখানে বিন্দু হইয়া গেল; অনন্ত-পূর্ণ-স্বরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। আমাতে জ্ঞান আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে জ্ঞান এই রক্তমাংস নহে। আমাতে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাই বলিয়া আমিই ঈশ্বর নহি। বিন্দু সিন্ধুর অংশ, কিন্তু বিন্দুকে সিন্ধু বলিলে সিন্ধুর কিছুই বলা হইল না। এ কথাটী অনেকে বুঝে নাই, আজও অনেকে বুঝিতেছেন না। বুঝিতেছেন না বলিয়াই, আজও চৈতন্য এবং যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। সে যাহা হউক, মানুষ যে আপনার অস্তিত্ব জগতের সহিত মিশাইয়া এক করিয়া দিতে পারে, সে কথা ঠিক;—মানুষ যে আপন স্বার্থকে পরার্থ করিয়া লইতে পারে, তাহা নিশ্চয়। যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন স্বার্থ-বিবর্জ্জিত অনেক মহাত্মা জন্মিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বার্থ-বিবর্জ্জিত, পরদুঃখ-কাতর, ভোগ-বিলাস-বিরত ম্যাট্সিনি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের স্থল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রেমের অবতার মহাত্মা ম্যাট্সিনি। এক প্রেমেতে ম্যাট্সিনি দরিদ্র ও অসহায় হইয়াও প্রভূত শক্তিশালী—জ্ঞানী—পৃথিবীর পূজ্য। এই মহাত্মার উদ্দেশে প্রবন্ধারম্ভে শত শত প্রণাম। ইনি প্রাতঃস্মরণীয়,—ইনি প্রতিভাশালী বীর,—ইনি শক্তি। যে শক্তি প্রভাবে ইতালী আজ পুনরুত্থিত, ইনি সেই শক্তির অবতার।

ম্যাট্সিনিকে প্রেম-খনি বলিলেও চলে, ম্যাট্সিনি বলিলেও চলে। জীবনের অতি প্রত্যূষে—ফুটন্ত বাল্যকালে এই প্রেমের লীলা-খেলা আরম্ভ হইল। যখন ম্যাট্সিনি ষষ্ঠ বর্ষ বয়সের শিশু, তখন একদা জননীর সহিত উপাসনালয়ে গিয়াছিলেন। সিঁড়ির উপরে একটী বৃদ্ধ ভিক্ষুক উপবিষ্ট ছিল। ম্যাটসিনি দেখিবামাত্র ব্যগ্র হইয়া ভিক্ষুকের নিকটে যাইয়া তাহার গলা ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন, এবং জননীকে কাতর-স্বরে বলিলেন, "মা ইহাকে কিছু দেও।" শিশুর প্রথম সংসার-দর্শনের দিনের এই আশ্চর্য্য ব্যবহার, এই মধুর কথা জননীর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল—সে কথা জননী জীবনে কখনও ভুলিলেন না। বৃদ্ধ ভিক্ষুক চমকিত হইয়া জননীকে বলিল—"Love him well, lady ; he is one who will love the people." পৃথিবীর বালকগণ যখন ধূলি-খেলায় মত্ত থাকে, ম্যাট্-সিনির প্রাণে তখনই প্রেমের এইরূপ আকর্ষণ বাড়িল;—বালকের খেলা হইল,

দুঃখীর দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করা,—আমোদ হইল, দুঃখীকে সাহায্য করা। বাড়ীতে ভিক্ষুক আসিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ম্যাটসিনির জননী ভিক্ষুককে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় না করিতেন, ততক্ষণ বালকের মন সুস্থ হইত না—চক্ষের জল থামিত না। ম্যাট্‌সিনি বিষাদ ও দুঃখপূর্ণ কাহিনী শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন; গল্প শুনিতে শুনিতে চক্ষের জল পড়িত। মাতৃ-ক্রোড় প্রেম-বিকাশের প্রথম স্থল; সেই মাতৃ-ক্রোড়ের প্রতি ম্যাট্‌সিনির অপরাজিত ভালবাসা ছিল,—সে ভালবাসা ভাষায় ব্যক্ত হয় না। বাল্যকাল হইতে মায়ের মুখচ্ছবি ম্যাট্‌সিনির সকল দুঃখের সান্ত্বনা ছিল। ম্যাট্‌সিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"মাতার অকৃত্রিম ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখিয়াই আমি পৃথিবীর জন্য অশ্রু ফেলিতে শিখিয়াছিলাম!" নির্ব্বাসনের অবস্থায় মাতার কথা মনে হইলেই অলক্ষিত ভাবে চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। এমন ভালবাসার বস্তুকেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, প্রসন্ন চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিন প্রহরীরা ম্যাট্‌সিনিকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ম্যাটসিনির পিতা সে সংবাদ শুনিয়া বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া সন্তানকে দেখিতে আসিলেন; প্রহরীদিগের অত্যাচারে ম্যাট্‌সিনির সহিত পিতার সাক্ষাৎ হইল না, ম্যাট্‌সিনি লোকের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "মাকে বলিও, আমি কয়েক দিবস পরেই ফিরিয়া আসিব, কোন ভয় নাই।" নির্ব্বাসনের অবস্থায় মাতার নিকট পত্র লিখিতে দিত না, কিন্তু ইহা ম্যাট্‌সিনির প্রাণে সহিত না, তিনি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া মাতার নিকট সর্ব্বদাই সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিয়া পাঠাইতেন। মা কাঁদিতেছেন, ইহা ম্যাট্‌সিনির প্রাণে বড়ই কষ্ট দিত। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—"More powerful upon me than any advice or any danger were the exceeding grief and anxiety of my poor mother, had it been possible for me to have yielded, I should have yielded to that." আবার দেখ, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এমন দেবদুর্লভ মাতৃপ্রেমকেও ম্যাট্‌সিনি তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন। দারুণ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একস্থলে ম্যাটসিনি বলিতেছেন,—"My own mother—blessed be her memory!—with the earnest deep-sighted love that looks forward to the future, prepared me to stand, unshaken in the midst of every misfortune." কি গভীর প্রেমের কথা!!

বাল্য খেলা শেষ হইলে, স্কুলের খেলা আরম্ভ হইল,—মাতৃ প্রেমের পার্শ্বে সেখানে বিকাশ পাইল—এক দিকে প্রতিভা, আর এক দিকে সুহৃদ্‌-প্রেম। —"In school he was loved and respected by his fellow students, for his good qualities of head and heart." স্কুলের বালকদিগের প্রতি অত্যাচার হইতেছে দেখিলে ম্যাট্‌সিনির চক্ষের জল সম্বরণ হইত না। কাহারও অভাব দেখিলে সে অভাব দূর না করিয়া থাকিতে পারিতেন না; আপনার পাঠ্য পুস্তক, পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিতরণ করিতেন। স্কুলে থাকিতে থাকিতেই মাতৃভূমি ইতালীর কালিমাময় চিত্র তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। ইতালীর দুর্দ্দশা—দুঃখ দারিদ্র্য—বিদেশীর অত্যাচার—ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতার অপলাপ দেখিয়া প্রাণে দারুণ জ্বালা আরম্ভ হইল। বালকের মুখ মলিন, পরিধেয় বস্ত্র মলিন। দিবসে, রজনীতে—গৃহে, বাহিরে এক প্রবল চিন্তাস্রোত ম্যাট্‌সিনিকে আক্রমণ করিল। যৌবন আগমন করে—মানুষকে বিলাসী করিতে,—সুখে মাতাইতে; ম্যাট্‌সিনির যৌবন আসিল—হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম-হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিতে। কি করিলে মানব-সমাজের অভাব দূর হইবে, কি করিলে দেশের অভাব দূর হইবে, কি করিলে ইতালী স্বাধীনতা পাইবে, কি করিলে সাধারণ লোকের উন্নতি হইবে, এই চিন্তা ম্যাট্‌সিনির প্রাণকে যৌবনের প্রারম্ভেই আক্রমণ করিল। তিনি জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন; "My spirit was crushed by the impossibility I then felt of even conceiving by what means to reduce it to action……in the midst of the noisy, tumultuous life of the scholars around me, I was sombre and absorbed, and appeared like one suddenly grown old. I childishly determined to dress alway in black, fancying myself in mourning for my country…Matters went so far that my poor mother became torrified lest I should commit suicide." এই মলিন হৃদয়ের ও মলিন চিত্রের দারুণ প্রেমের টানে, স্কুলের ছাত্রবর্গ তাঁহার সঙ্গ-ছাড়া হইত না, স্কুলের ছুটী হইলে ম্যাট্‌সিনির বাড়ীতে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইত। প্রাণে দেশের অধীনতার চিত্র, বাহিরে ছাত্রদের জীবনের অভাব, ম্যাট্‌সিনিকে মাতাইয়া তুলিল। লোকের অভাব দেখিলে তাহা দূর না হইলে আর সুস্থ হইতে পারিতেন না। স্কুলের পাঠ্য এক প্রকার শেষ হইলে, প্রথমে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, কিন্তু শব-ছেদনে ম্যাট্‌সিনির পীড়া হওয়ায় তাহা

পরিত্যাগ করিয়া আইন পড়িয়া নব্য উকীল হইলেন। ম্যাট্‌সিনি যখন উকীল হইলেন, তখন পিতা মাতার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না। কিন্তু তিনি ওকালতি কি করিবেন?—উকীল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—পিতা মাতার আশা ভরসার মূল উচ্ছেদ করিয়া দেশের জন্য জীবনকে কেমন করিয়া উৎসর্গ করিবেন, কেমন করিয়া লোকের সেবা করিবেন। ইতালীতে ওকালতির যে দুই বৎসর দরিদ্রদিগের মকর্দ্দমা অবৈতনিক ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, সে দুই বৎসর ভাল ভাবেই গেল—দুঃখীদের চক্ষের জল কতক নিবারণ করিতে পারিবেন, সমদুঃখী দরিদ্রদিগের অভাব দূর করিতে পারিয়া কতক সুস্থ হইলেন। তৎপরে তিনি দেশোদ্ধারের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটী গুপ্ত সভায় যোগদান করিলেন। সে সভায় যোগ দিয়া তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হইল না;—কারণ সে সভার সভ্যগণের ধর্ম্মবিবর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে তিনি মর্ম্মপীড়িত হইলেন। কিন্তু এ সভার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি উক্ত গুপ্ত সভা-সংশ্লিষ্ট কোন অপরাধে সেভনার দুর্গে ছয় মাসের জন্য বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় ইতালীর অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র তিনি আবিষ্কার করিলেন—"উপরে ঈশ্বর, নিম্নে মানব সন্তান, ইহার মধ্যে আর কোন মধ্যবর্ত্তী নাই। অনন্তের ধ্যান ভিন্ন মানবের আর পরিত্রাণের পথ নাই। ধর্ম্মবল ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের আর সহায় সম্বল নাই। মানব কেবল রাজার অধীন নহে, আচার ব্যবহার, টাকা কড়ি, বিলাস প্রলোভন—পৃথিবীর সকলে মিলিয়া মানুষকে দারুণ অধীনতায় পূরিয়া রাখিয়াছে; ইহাদের হস্ত হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে হইলে ধর্ম্ম-ভিন্ন আর উপায় নাই।" এই চিন্তা ম্যাটসিনির মনে সেই সেভনার ক্ষুদ্র দুর্গে উদিত হইল। সেভনার ক্ষুদ্র গৃহের এক দিকে অনন্ত আকাশ, অন্য দিকে বিস্তৃত সমুদ্র, ম্যাট্‌সিনের প্রাণে অনন্তের ভাব জমাইয়া দিল। জ্বলন্ত নিরাশার মধ্যে আশা-পবন রহিল;—মনে উদিত হইল—"All great national enterprises have even been originated by men of the people, whose sole stregth lay in that power of faith and of will, which neither counts obstacles nor measures time." এই চিন্তাতে সিংহের বল হৃদয়ে সঞ্চিত হইল;—"মানুষ ঈশ্বরের সন্তান—ধর্ম্মযাজক বা রাজার অধীনতার হস্ত হইতে অবশ্য মুক্তি পাইবে, চেষ্টা করিলে সকল অসম্ভব সম্ভব হইবে," এই চিন্তায় বিভোর হইয়া লিখিলেন,—

"And I saw Europe, weary of scepticism, egotism, and anarchy, accept the new faith with acclamations" "Such" he says, "were my thoughts in my little cell at Savona;" অন্য স্থলে ৪০ বৎসর পরে লিখিতেছেন—"I think the same thoughts still, on broader grounds, and with maturer logic in the little room, no longer than that cell, wherein I write these lines, and during life they have brought upon me the title of Utopist and madman, together with such frequent disenchantments, and outrage as have often caused me—while yet some hopes of individual life yearned whithin me—to look back with longing and regret to my cell at Savona between Sea and Sky, and far from the contact of men."

কারাবাসের অবস্থায় কখনও ম্যাট্‌সিনি ক্ষুণ্ণচিত্ত হন নাই; কর্ত্তব্য পালন করিয়া মরিতে পারিলেও সুখ, সদাই মনে হইত। বন্দীভাবে ছয়-মাস অতীত হইলে ফ্রান্স দেশে নির্ব্বাসিত হইলেন। ফ্রান্সের মার্‌সি-লিজ নগরে গুপ্তভাবে তিনি "নব্য-ইতালী সভা" প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং ঐ নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের নামে নব্য-ইতালীকে উৎসর্গ করিয়া, মনুষ্যত্ব লাভের এক মাত্র উপায়, স্বাধীনতার বীজ বপন করিলেন। কিন্তু নব্য-ইতালী ধর্ম্মশূন্য স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হইয়া গঠিত হইল না। কেবল স্বাধীনতাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের লেখা কত সুন্দর!—

"Liberty is but a means. Your task is to found the Universal Family, to build up the City of God, and unremittingly to labour towards the active, progressive fulfilment of His great work in Humanity." মানুষ ভাই ভাই,—বড় ছোট সকলেই ঈশ্বরের সন্তান,—ভেদাভেদ নাই—রাজা প্রজা নাই—সকলেই অনন্ত উন্নতিশীল, সকলেই এক পথের পথিক। সকলকে মিলাইয়া ঈশ্বরের-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। নব্য-ইতালীর কঠোর নিয়মাবলীতে ম্যাটসিনি আপনি অগ্রে নাম লিখিলেন—চিরজীবনের জন্য ইতালীর এবং মানব সন্তানের উদ্ধারের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্‌-সিনি জন্মগ্রহণ করেন, নব্য-ইতালী ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়া ম্যাটসিনিকে জীবনে যে কষ্ট সহ্য করিতে হইল, তাহা আর সংক্ষেপে কি বলিব! ছলনায়, লোকের অত্যাচারে সমস্ত জীবন প্রায়

কারাবাসে ও নির্ব্বাসনেই অতিবাহিত হইল। নির্ব্বাসনে থাকিয়াও মানবের উন্নতির চেষ্টা করিতেন, শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেন, সংবাদ পত্রে লিখিতেন, সাধারণের কলুষিত জীবনকে সংস্কৃত করিতে চেষ্টা করিতেন; মানুষের কল্যাণের জন্য সেখানেও অবিরত পরিশ্রম করিতেন। উপবাস-অনাহারে ম্যাটসিনিকে জীবনের অনেক সময় থাকিতে হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও পরোপকারের কথা বিস্মৃত হন নাই। মানুষ মানুষের নিকট উপকার পাইয়াও প্রত্যুপকার করে না, ম্যাটসিনি শত্রুতার জ্বালা যন্ত্রণা আজীবন ভোগ করিয়াও পরোপকারে ব্রতী রহিলেন। লোকের সামান্য উপকার করিতে যাইয়া একটু ক্ষতি হইলে, মানুষের প্রাণ হিংসা-পীড়নে অধীর হয়, ম্যাটসিনি সমস্ত জীবন কত কষ্ট সহ্য করিলেন—পরের উপকারের জন্য! স্বার্থত্যাগ ম্যাটসিনির প্রতি শিরায় শিরায়, প্রতি ধমনীতে ধমনীতে লেখা। কি এক গভীর প্রেমের খেলায় মত্ত, কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া বোধ হইত না। ম্যাটসিনির জীবন-কাহিনীর প্রতি ঘটনায় সেই প্রেমের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সামান্য প্রবন্ধে আর কত ঘটনার উল্লেখ করিব। জীবনে এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু তবু এক দিনের জন্যও মুখ মলিন হয় নাই,—সদাই প্রসন্ন, সদাই গম্ভীর মুখ,—কারাবাসও যেমন ম্যাটসিনির স্বর্গবাস। প্রসন্ন চিত্ত—প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়, সেখানেও দুঃখীর দুঃখ যন্ত্রণা অপনয়নে ব্রতী। নির্ব্বাসনেও হৃদয়ের অপরাজিত দয়া। জীবনের কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর নরনারীকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই বলিতেন—'Say not I, but we,' এই কথা ম্যাটসিনির জীবন-বাক্য ছিল, "কেবল আমি নহি, আমরা সকলে।" ম্যাটসিনির মাতা কষ্টের কথা শুনিয়া সন্তানের জন্য যাহা পাঠাইতেন, তিনি কয়েদীদিগকে প্রসন্ন চিত্তে তাহা বিতরণ করিতেন, আপনি উপবাস করিয়াও অন্যের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। রাস্তার লোক ধরিয়া ধরিয়া উপদেশ দিতেন। যুবা বৃদ্ধ সকলে সে উপদেশ শুনিত। নির্ব্বাসনের অবস্থায় যখন দুঃখ কষ্ট ভীষণ রবে ম্যাটসিনিকে আক্রমণ করিল, তখন কতিপয় বন্ধু লক্ষ্য পথ পরিত্যাগ করিতে ম্যাটসিনেকে পরামর্শ দিয়াছিল; কিন্তু ম্যাটসিনি তাহাদিগকে অটলভাবে বলিতেছেন—"If you love me, let me die with Rome"—আমার এই ইচ্ছা, রোমের উন্নতির চিন্তা লইয়া যেন মরিতে পারি। ইহাপেক্ষা প্রেমের জীবন্ত বাক্য আর কি হইতে পারে!!

এক সময়ে ম্যাটসিনির মনে সন্দেহের রেখা উদিত হইল,—আমি যাহা করিতেছি, ইহাই ঠিক কি না? ভাবিতে ভাবিতে কূল কিনারা পাইলেন না—চতুর্দ্দিক আঁধারময় বোধ হইল। ম্যাটসিনি সেই চিন্তায় উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিতেন—পাগলের ন্যায় জানালার নিকটে ছুটিতেন; এই ভাবে কিয়দ্দিবস গত হইল। কিয়দ্দিবস পরে চিন্তা করিয়া কূল পাইলেন, বিবেকের স্পষ্টবাণী শুনিলেন,—সুস্থ হইলেন। বিবেকের আদেশে কর্ত্তব্যের দৃঢ় জ্ঞান প্রাণে উদিত হইল;—ক্ষুদ্র প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আপন দলের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"You are cowards, unfaithful to your own future, if, in spite of sorrows and delusions, you do not pursue it to the end."

"* * * Whether the sun shine with the serene slpendour of an Italian morn, or the leaden corpse-like hue of the northern mist be above us, I cannot see that it changes our duty." "কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া যে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, তাহার ন্যায় মূর্খ কে? সূর্য্যের প্রখর রশ্মিই দীপ্তি পাউক কিম্বা প্রবল ঝড়ই বহুক, বুঝি না, কেন কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিব।" কঠোর কর্ত্তব্য বোধে ম্যাটসিনি আজীবন জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিলেন—মানবের উদ্ধারের জন্য প্রাণকে ভাসাইলেন; আপন সুখ-বিলাস,—পিতার স্নেহের মধুর সম্ভাষণও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। লোক যখন মত্ত হয়, তখন এমনি করিয়াই হয়। ম্যাটসিনির মাতার মুখ-ছবি জীবনের বড় প্রিয় জিনিষ। কিন্তু মানবজাতির প্রেমের টানে তাহাকেও তুচ্ছ করিলেন,—জগতে নিঃস্বার্থ ভাবের কি দৃষ্টান্তই রাখিয়া গেলেন!—কিছু-তেই ম্যাটসিনিকে বিচলিত করিতে পারিল না—

"But even were these c onsolations denied me, I believe I should still be what I am."

অনেকের বিশ্বাস, ম্যাট্‌সিনি সঙ্কীর্ণ দেশ-উদ্ধারের জন্যই বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, মানবজাতির কল্যাণের জন্য কিছুই করেন নাই। এ কথাটী অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। ম্যাটসিনি সর্ব্বদাই মানবজাতির কল্যাণের কথা বলিতেন। প্রতি কথা, প্রতি চিন্তাতে—মানবজাতির কিসে উন্নতি হইবে, এই ভাব স্ফূরিত। যাঁহার ইচ্ছা হয়, তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন। আপন দেশ সংশোধনের চেষ্টা করিতেন, সে এই জন্য যে, এক দেশ

উদ্ধার হইলেই অন্য দেশের উপকার হইবে। তাঁহার নিজের ভাষা এই, "In labouring for our own country, we labour for humanity."

মানবের মঙ্গলের কথা তাঁহার জীবন-ভূষণ ছিল। ম্যাটসিনির বিশ্বাস ছিল, সমগ্র দেশের উন্নতি করিতে হইলে এক সীমাবদ্ধ স্থান হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। আপনার দেশকে সংশোধন, পরিবারকে সংশোধন এবং আপনাকে সংশোধন করিলেও মানবজাতির কল্যাণের জন্য অনেক করা হইল। কারণ এত গুলি লোক সংশোধিত হইলে, দৃষ্টান্তানুকরণে পৃথিবীর অনেক উপকার হইবে; অন্তত ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর যে অপকার হইত, তাহা ত হইল না। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্পেন্সার ঠিকই বলিয়াছেন ;—

"Since the goodness of a society ultimately depends on the nature of its citizens ; and since the nature of its citizens is more modifiable by early training than by anything else ; we must conclude that the welfare of thc family underlies the welfare of society."

আপনার জন্য ম্যাটসিনি আর কিছুই রাখিলেন না—আপনার সর্ব্বস্ব দেশের উদ্ধারের জন্য, মানব সমাজের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিলেন, উদার প্রেমিক সন্ন্যাসী বলিতেছেন,—"I bade a long, sad farewell to all individual hopes for me on earth. I dug, with my own hands, the grave, not of my affections,—God is my witness, that now, greyheaded, I feel them yet as in the days of my earliest youth—but of all the desires, exigences, and ineffable comforts of affection, and I covered the earth over that grave, so that none might ever know the Ego buried beneath,"বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দুঃখ যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়াও মানবের হিত চিন্তায় রত রহিলেন। অত্যাচারী রাজার অত্যাচার একদিকে, ম্যাটসিনির অধ্যবসায় ও চেষ্টা অপরদিকে। গোপনে কত সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিলেন, কত বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলেন। গোপনে গোপনে কত লোককে মাতাইয়া তুলিলেন। একজনের প্রেমে ইতালী মাতিয়া উঠিল—দুর্ব্বল প্রাণে বল ও সাহস আসিল। বিলাসী বিলাস পরিত্যাগ করিয়া দলে যোগ দিল, বৃদ্ধ নববলে বলীয়ান হইয়া ম্যাটসিনির সহায় হইল। যাহা ঘটিবার, ঘটিল। কত যুদ্ধ কত বিপদের পর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমে স্বাধীন-তন্ত্র ঘোষিত হইল।

ম্যাটসিনির জীবনের সুখের দিন উপস্থিত হইল। পবিত্র রোম সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—"Rome was to me, as, in spite of her present degradation, she still is, the temple of humanity. From Rome will one day spring the religious transformation destined, for the third time, to bestow moral unity upon Europe."

কিন্তু লোকের চক্রান্তে ম্যাটসিনির সুখের স্বপ্ন ফুরাইল, আবার যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইল, শেষ ফল এই হইল,—স্বাধীন ইতালীতে রাজতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। দারুণ যন্ত্রণায় ম্যাটসিনির হৃদয় আবার আচ্ছন্ন হইল। শেষ জীবনের কষ্ট ম্যাটসিনির আর ঘুচিল না—সকল চেষ্টা পুরাস্থ হইল। বিষাদে মগ্ন হইয়া তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে সিসিলীতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথি মধ্যে আবার বন্দী হইলেন। ঈশ্বরের কৃপায় একটী রাজপুত্রের জন্ম উপলক্ষে এবার মুক্ত হইলেন। মুক্ত হইয়া বাল্যক্রীড়াস্থল—জীবনের আশা-স্থল রোমকে সজল নয়নে দূর হইতে জন্মের মত দেখিয়া যাত্রা করিলেন। ইতালী "Profaned by monarchy," দেখিতে প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইলেন। জেনোবাতে মাতৃ গোরস্থান, তীর্থস্থানের ন্যায় দর্শন করিয়া, ইংলণ্ডে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইবেন, স্থির করিয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে কর্ত্তব্যপরায়ণ ম্যাটসিনি দেশের কথা ভুলিয়া থাকিতে পারিলেন না—কর্ত্তব্যের মর্ম্মদাহ সেখানেও তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; তিনি জুগালোতে ফিরিয়া আসিয়া 'রোমেরপ্রজা' নামক পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন। এই খানেই জীবনের শেষ অভিনয় হইল—কয়েক বৎসর অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। অবসন্নতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে আবার বৃদ্ধ বয়সে ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল শরীর আল্পস পর্ব্বতের দারুণ দুঃসহ শীত সহ্য করিতে পারিল না; ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ফুসফুস-প্রদাহে আক্রান্ত হইয়া তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। জনপ্রাণী-হীন প্রদেশে, চির-নির্ব্বাসিত অমরাত্মা শরীরকে পরিত্যাগ করিল। মৃতদেহ জেনোবাতে আনীত হইল, এবং সেইখানে অস্থিপঞ্জর প্রোথিত হইল। ম্যাটসিনির জীবন এইভাবে শেষ হইল। মাটীর শরীর মাটীতে পড়িয়া রহিল। প্রেমের শেষ-লীলা জন্মের মত নিবিয়া গেল! প্রেমে যে জীবন আরম্ভ—প্রেমের অনুরোধ পালনেই সেই জীবন শেষ হইল। মৃত্যুর পর লোকেরা বুঝিল, কি সোণার পাখী উড়িয়া পলাইল। সামান্য লোক হইয়াও লোকের এত ভালবাসা পাইয়াছিলেন যে, মৃতদেহ

যখন গোর-স্থানে নীত হইতে লাগিল, তখন ৮০ সহস্র লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চতুর্দ্দিক হইতে ক্রন্দনের রোল বিশাল আকাশে অমরাত্মাকে ধরিতে উঠিল। দীনদুঃখীর প্রাণ অধীর হইল। সাধারণ লোকের এমন ভালবাসা, আর কে কবে পাইয়াছে?

ম্যাটসিনি এখন স্বর্গে,—প্রেমের অবতার প্রেমময়ীর চরণাশ্রয়ে শান্তি লাভ করিয়াছে। ম্যাটসিনির ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রেমিক ধার্ম্মিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না। জগতের উদ্ধারের জন্য, একদিন প্রাণ ভাসাইয়াছিলেন—খ্রীষ্ট, —আর সে দিন, চক্ষের সম্মুখে প্রাণ ভাসাইলেন—ম্যাটসিনি। শয়নে, স্বপনে, চলনে, উপবেশনে, আহারে বিহারে, প্রেমবিহ্বল ম্যাটসিনি ক্ষীণ কণ্ঠে গাইলেন—কেবল ঈশ্বরের নাম। ভোগ-বিলাস-প্রলোভন-অনাসক্ত—ইন্দ্রিয়-সুখ-চাঞ্চল্য-বিরহিত বীর, অবিচলিত ভাবে স্বদেশের—সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য, তাঁহাদের চরণতলে জীবনকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া গেলেন। কার্য্যের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন খাটিয়াই মরিলেন। যেমন মুখে বলিতেন, "God created us, not to contemplate, but to act. He created us in His own image,and He is *Action* and *Thought* or rather, in Him there is no Thought which is not simultaneous Action." কার্য্যেও তেমনি করিতেন।—"কেবল চিন্তার জন্য নহে—ঈশ্বর কার্য্যের জন্য আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি আপন প্রকৃতিতে মানুষকে সৃজন করিয়াছেন। তাঁহাতে কার্য্য এবং চিন্তা একত্র সম্মিলিত, অথবা তাঁহাতে কার্য্যশূন্য চিন্তা নাই।" ক্ষুদ্র মানবশিশু গম্ভীরভাবে এই কথা বলিলেন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এ কথার জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ম্যাটসিনিকে কর্ত্তব্যের অবতার বলিলেও চলে, কিম্বা প্রেমের অবতার বলিলেও হয়। প্রেম আর কর্ত্তব্য একত্রে। যেথানে প্রেম নাই, সেথানে কর্ত্তব্য নাই। মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলে, আর তাহাদের উন্নতির জন্য প্রাণ কাঁদিবে কেন? প্রাণ না কাঁদিলে প্রকৃত প্রস্তাবে লোকের উপকার করা যায় না। জীবনে কর্ত্তব্য-পালনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, এবং লেখনীতে অবিনশ্বর ভাষায় 'মানবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে, অমৃতময় ভাষায়, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সেই গম্ভীর প্রসন্ন মুখ পৃথিবীর অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার লেখনীর অমৃতবর্ষী কথা-লহরী মানবের চক্ষুকে স্পষ্ট করিতেছে;—স্বর মিলাইয়া গিয়াছে—কিন্তু ভাষা আজও পৃথিবীর

প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে। সাধারণ লোকদিগের জন্যই ম্যাটসিনির জন্ম, তাহাদের উন্নতির জন্যই জীবন পাত, এবং তাহাদের উন্নতির জন্যই লেখনী ধারণ। মুখে বলিতেন, একই কথা—কি করিলে দেশের লোকের উন্নতি হইবে,—কেমনে মানুষ ধার্ম্মিক হইবে; লেখনীতে লিখিতেন তাহাই—কিসে সাধারণ লোকের মঙ্গল হইবে, কি করিলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার লেখার প্রতি পংক্তি ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ। এমন পৃষ্ঠা নাই, যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই। এমন একটী প্রবন্ধ নাই, যাহাতে মানবের উন্নতির কথা নাই। 'মানবের কর্ত্তব্য' নামক প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে তাঁহার জলন্ত ধর্ম্মভাব, বিশ্বাস ও প্রেমের ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে। উহা এতই সুন্দর যে, এক ছত্র রাখিয়া আর এক ছত্র তুলিয়া উপহার দেওয়া যায় না। এমন আশ্চর্য্য জিনিষ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার কার্য্য ছিল না, ঈশ্বর ভিন্ন কথা ছিল না। আপন জীবনে যাহা, অন্যকেও তাহাই বলিতেন;—"Be your country your Temple, God at the summit, a people of equals at the base."

একমাত্র পরব্রহ্মই মুক্তির সোপান—তিনিই আশ্রয়, তিনিই গতি, ইহাই তাঁহার প্রাণগত বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বর ও আত্মা, ইহার মধ্যে আর কোন মধ্যবর্ত্তী নাই, এইটী প্রাণের কথা ছিল। সরল বিশ্বাসের সরল কথা,—"There is not, there cannot be, infallibility either in man or Powers * * * there is not and there cannot be need of any interpreter between God and man." সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল সময়েই অনন্তের ভাব তাঁহার প্রাণকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। ম্যাটসিনি যদি খ্রীষ্ট-সমাজের লোক হইতেন, আজ তাঁহার গৌরব কাহিনীতে পৃথিবী টলমল করিত। আমাদের বিশ্বাস,—লুথার ও সেণ্টপলের জীবন অপেক্ষাও ম্যাটসিনির জীবন ভক্তি বিশ্বাসে অনেক উন্নত, কিন্তু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসবিরোধী বলিয়া আজ ম্যাটসিনির নাম অনাদৃত। ম্যাটসিনি এক মাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন; সাম্প্রদায়িকতার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন; পৌরহিত্য-প্রথার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। মানুষ মানুষের দাস হইবে—সম্প্রদায়ের দাস হইবে, গুরুর দাস হইবে—ইহাও তাঁহার সহ্য হইত না। মানুষকে ঈশ্বরাবতার বলিতে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেন, "*We own but one master in heaven,*—*God,* and but one interpreter of His law

on earth,—the people." মানুষ পরস্পর ভাই ভাই; ভাই ভাইয়ের উন্নতি করিবে—ভাইকে ভালবাসিবে—মানবজাতির কল্যাণের চেষ্টা করিবে। মানবজাতির উন্নতির চেষ্টাই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্য-পালনই মানবের লক্ষ্য,—কর্ত্তব্যের মূলে ঈশ্বর। তাঁহার নিজের ভাষা এই,—"This principle is Duty. We must convince men that they are all sons of one sole God, and bound to fulfil and execute one sole law here on earth: that each of them is *bound to live, not for himself, but for others*; that the aim of existence is, not to be more or less happy, but to make themselves and others more virtuous; that to struggle against injustice and error (wherever they exist), in the name and for the benefit af their brothers, is not only a *right* but a Duty; a duty which may not be neglected without sin, the duty of their whole life." 'একমাত্র কর্ত্তব্যপালনের জন্যই মানবের সৃষ্টি। মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, এবং প্রত্যেকে তাঁহার আদিষ্ট কর্ত্তব্য পালনের জন্য দায়ী। জীবন আপনার জন্য নহে, পরের জন্য। আপনার সুখ লাভের জন্য জীবন-ধারণ নহে,—কিন্তু অন্যকে সুখী করা ও আপনাকে ও অন্যকে নীতিপরায়ণ করার জন্যই জীবন। এ কর্ত্তব্য সকলকেই পালন করা উচিত। যিনি পালন না করেন, তিনি মহাপাপে পাপী।' কি উদার কথা, কি উচ্চ নীতি! এমন উদার কথা উচ্চ প্রেমিক ভিন্ন কে বলিতে পারে? কেইবা বুঝিতে পারে? মানুষ কেবল পরের জন্যই জীবন ধারণ করিবে, একথার জীবন্ত দৃষ্টান্তই বা কয়জনে দেখাইতে পারে? প্রেমিক ভক্ত বলিতেছেন;—

"Preach duty to the Classes above you, and fulfil, as far as in you lies your own. Preach virtue, sacrifice and love; and be yourselves virtuous, loving and ready for self-sacrifice."

স্থানান্তরে—"And so long as you are ready to die for Humanity, the life of your country will be immortal."

কত কথাই বা তুলিব, আর কত কথাইবা বলিব। যাঁহার লেখার প্রতি পংক্তিতে প্রেমের অস্ফুট ছায়া, কথার প্রতি অক্ষরে প্রেমের অপূর্ব্ব জ্যোতি, তাঁহার কথা, অপ্রেমিক আমরা, আর কি বলিব? যিনি তাঁহার লেখা কখনও পাঠ করেন নাই, তিনি আমাদের কথায় তাঁহার প্রেমের কিছুই আভাস পাইবেন না, এই চিন্তায় প্রাণে আঘাত লাগিতেছে। কথা ফুরাইয়া যায়, অথচ ভাব প্রকাশ হয় না, এ দুঃখ কোথায় রাখিব?

ম্যাটসিনি প্রেমিক ছিলেন, ইহাই অদ্যকার প্রবন্ধের আলোচ্য। উচ্চ অঙ্গের প্রেমিকই উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানী। ম্যাটসিনির জ্ঞান এবং অন্যান্য গুণ আজ কাল সভ্যজগতের চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছে। এমন কি, ম্যাটসিনির ন্যায় উচ্চ রাজনীতিজ্ঞ উনবিংশ শতাব্দীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা অনেক মহা মহা পণ্ডিতগণও বলিতেছেন। ম্যাটসিনি যে মহা পণ্ডিত ছিলেন, সে কথাও অনেকে বলিতেছে,। অনেকে বলিতেছে, ভবিষ্যতে আরো অনেকে বলিবে। প্রেম ও ধর্ম্ম ভাবের কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, আমাদের দ্বারা তাহার কিছুই হইল না। প্রেমহীন-জীবন, প্রেমিক-জীবনের গুণ-কীর্ত্তনে, কেমনে সক্ষম হইবে? বিনীত ভাবে প্রার্থনা, ম্যাটসিনির গভীর প্রেমতত্ত্ব, এই মলিন ভাষায় পড়িয়া, তাঁহার প্রতি কেহ বিরক্ত হইবেন না। তিনি ভগবৎ-প্রেম-ভক্তিতে মানব সমাজের আদর্শ ও পূজ্য।

এক দিন শক্তির বিষয় ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, মানুষ ক্ষুদ্র কি মানুষ মহৎ! মানুষ ক্ষুদ্র তখনই—যখন মানুষ আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। মহৎ তখনই, যখন প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ অন্যকে আলিঙ্গন করে—অন্যের অশ্রু মুছাইয়া দেয়—পর-দুঃখ অপসরণে জীবনকে বলি দেয়। প্রেম-হীনতায় মানব ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র। এক প্রেমে মানুষ অতি উচ্চ, অতি মহৎ! প্রেমের বন্যা যে জীবনে প্রবাহিত, সে জীবন কি না করিতে পারে?

লোকে বলে অর্থ নাই, বল নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, পৃথিবীর কি কার্য্য করিব? আমরা বলি, কার্য্য করি না, কারণ আমাদের ইচ্ছা নাই, প্রেম নাই। প্রেমই ইচ্ছা, ইচ্ছাতেই কার্য্য। ইচ্ছা করিয়া দেখ, পাহাড় পর্ব্বত সমান বাধাবিঘ্ন চলিয়া যাইবে। অর্থহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন একা ম্যাট-সিনি ইতালীতে সে দিন কি করিয়া গেল, একবার চিন্তা কর। সূত্রধরের সন্তান একাকী পৃথিবীতে কি করিয়া গিয়াছেন, চিন্তা কর। টাকাতে পৃথি-বীর কার্য্য হয়, যে মনে করে, তাহার ন্যায় ভ্রান্ত আর নাই। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন—"আমি সকল করিতে পারি, এই জন্য যে, আমার কিছুই নাই।" প্রেমেই টাকা, ইচ্ছাতেই কার্য্য। ধর্ম্মের কথা নহে, এ সংসারের সোজা কথা। টাকা অগ্রে সঞ্চয় করিয়া কেহ পৃথিবীর কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারিয়াছে, শুনিয়াছি কেহ? টাকা সঞ্চয় কর—আয়ে বাসনার

আগুন বাড়িবে। কে খাওয়াইবে, কে দিবে, কে পরাইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া যে অস্থির হয়, সে পৃথিবীর কি কার্য্য করিবে? প্রেমে ভাবনা চিন্তা নাই;—কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইবে, এই মাত্র জানি, না করিলে প্রাণ অস্থির হয়, এই মাত্র বুঝি, আর কিছুই জানি না; এই প্রকার দৃঢ়তার সহিত যে কার্য্য করিতে যায়, সেই সিদ্ধ হয়। যিনি মঙ্গলময়ী, তিনিই অভাব পূর্ণ করিবেন; আমরা কেবল কার্য্য করিব—খাটিব—মরিব। যার মা আনন্দময়ী তার ঘরে চিন্তা, বিষাদ—নিরানন্দ থাকিবে না। সে আনন্দ—মহানন্দ, সচ্চিদানন্দ। প্রেমে অনুরঞ্জিত হও—আর সকল ভাবনা চলিয়া যাইবে। প্রেমে পূর্ণ হও, সকল জ্ঞানলাভ হইবে। প্রেমে পূর্ণ হও, সকল অভাব দূর হইবে। বিশ্ব-জননী উপরে, নিম্নে মানব সন্তান। তাঁহার প্রেমে রঞ্জিত হইয়া ভ্রাতা ও ভগিনীর উন্নতি-সাধনের জন্য প্রাণকে ভাসাও, দুঃখীর অশ্রু মুছাইতে ধাও। আপনাকে ভুলিয়া অন্যের জন্য জীবনকে উৎসর্গ কর। করিয়া দেখ অসাধ্য সাধিত হয় কি না? অপ্রেমিক, তুমি করিবে, ভাবিতেছ?—মূর্খ মানব, দূর হও। বিশ্ব-প্রেম অবতীর্ণ না হইলে কিছুই পারিবে না। প্রেমের সাধনা কর। পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া জল বাহির কর, তবে ত অসাধ্য সাধিত হইবে। শিক্ষা-বিস্তারের কথা বল, একতা বল, জ্ঞান বল, সকলের মূলে প্রেম; প্রেমেই শক্তি, প্রেমেই মুক্তি। প্রেমেই বল, প্রেমেই জ্ঞান। প্রেমহীন মানুষ পশু, প্রেমেই মানুষ দেবতা। সিন্ধুতে বিন্দু হইয়া ডুবিয়া প্রেমে রঞ্জিত হও—বিশ্বের অন্তরালে যে চিদ্‌ঘন আনন্দ—সদানন্দ-স্রোত প্রবাহিত, তাহাতে নিমগ্ন হও। নিশ্চয় বলিতে পারি, দেশ উদ্ধারের জন্য আর কোন শক্তির প্রয়োজন নাই—কেবল প্রেম চাই। 'সবে ধন নীলমণিকে' পাইলেই হয়। আর কিছুই চাই না—কেবল প্রেম চাই। প্রেম আসিলে জ্ঞান অবতীর্ণ হইবে—বুদ্ধি অবতীর্ণ হইবে, কল্যাণ অবতীর্ণ হইবে, মঙ্গল অবতীর্ণ হইবে, অর্থ ঐ অনন্ত নীলিমা ভেদ করিয়া নামিবে। মানবের যদি কোন কিছুর অভাব থাকে, তবে সে অভাব কেবল প্রেমের;—বিশ্ব-প্রেমের—উদার প্রেমের। সেই প্রেম, যে প্রেমে ভেদাভেদ, সর্ব্বপ্রকার জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা নাশ করে। সেই প্রেম, যাহাতে ধনী দরিদ্রের গণনা থাকে না। সেই প্রেম, যাহা পাইলে মানুষ চুপ করিয়া অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না। সেই প্রেম, যাহা পাইলে মানুষ অন্যের অশ্রু মুছাইতে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হয়। যোগী ঋষিদের যে

প্রেম ছিল না, তাহা চৈতন্যের ছিল; তাহা খ্রীষ্টের ছিল, তাহা ম্যাট্‌সিনির ছিল। যে প্রেম কর্ত্তব্য-বোধ জন্মায় না, সে প্রেম প্রেম নহে। যে প্রেমে কার্য্য নাই, তাহা প্রেমের অপভ্রংশ মাত্র,—সে প্রেমে জীবন নাই, তাহা শুষ্ক, তাহা মৃত প্রেম। প্রেমিক নিতাই গৌরের প্রেম দেখ, আর প্রেম দেখ, প্রেমিক ম্যাটসিনির। "মানুষ আয় তোকে বুকে পুরি—আয় তোর চক্ষের জল মুছাই, আয় দুজনে মিলিয়া ভগবৎ প্রেমের গান গাই।" এই ভাবে পূর্ণ হইয়া একবার হরির গান গাইল, সোণার কণ্ঠে—গৌর আর নিতাই, আর সেদিন গাইল—ইতালীকে মাতাইয়া, দরিদ্র ম্যাটসিনি। ঈশ্বর প্রেমসিন্ধু; সেই সিন্ধুতে—খ্রীষ্ট, গৌরাঙ্গ, নিতাই, ম্যাটসিনি বিন্দু। প্রেমসিন্ধুর কৃপায় মানুষ বিন্দু হইয়া পৃথিবীতে কি কাণ্ড বাধাইয়া গেল, মানুষ একবার ভাব, একবার চিন্তা কর।

# আশার কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাচীন ভারত 'নব্যভারত' নামে অভিহিত হইয়াছে। পৃথিবীর যদি বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে পৃথিবী বুঝিবে—প্রকৃত পক্ষেই ভারত বর্ত্তমান সময়ে 'নব্যভারত' নামে পৃথিবীর কাহিনীতে আখ্যাত হইবার যোগ্য। ভারত যে নববেশ ভূষিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন, একথা আমার প্রচার না করিয়া থাকিতে পারি না। সত্য-কাহিনী প্রচার করিবার সময় বাধা বিঘ্ন স্মরণ করিয়া যে নিরস্ত থাকে, সে মূর্খ। প্রাচীন ভারত নববেশে জগতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আমরা একথা বলিব—কাহারও কথা শুনিব না। ইতিহাস-লেখকগণও সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কলম ধরিয়া এই কথা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিবেন।

কি?—ভারত নূতন? প্রাচীন ভারত আবার নূতন হইল? বৃদ্ধও কি যুবকে পরিণত হইতে পারে? এ কি শাস্ত্র? পুনর্জ্জন্মে কি তবে বিশ্বাস করিতে হইবে? প্রাচীন ভারত আরও প্রাচীন হইবেন, না পুনঃ নবীনত্বে পরিণত হইলেন? কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন। আমরা বলি, এ সকলি সম্ভব। জড়জগৎ হইতে প্রাণিজগৎ পর্য্যন্ত, সকলেরই উত্থান ও পতন আছে। বৃক্ষের পুরাতন

পত্র ঝরিয়া পড়ে—আবার নূতন পত্র শাখা প্রশাখাকে শোভিত করে;—মনুষ্যের নিস্তেজ ও মলিন অঙ্গও সময় বিশেষে সতেজ হইয়া কত শোভা ধারণ করে। এক বার মনুষ্য নীতি সম্বন্ধে হীন হয়; পতিত হয়—আবার উজ্জ্বল বর্ণে শোভিত হয়—সুনীতিতে ভূষিত হয়। এই মর্ত্ত্যজগতে এমন লোকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, যে একবার পতিত হইয়া না উঠিয়াছে,—একবার মরিয়া যে না বাঁচিয়াছে। মনুষ্য একবার মরে, আবার বাঁচে; একবার বৃদ্ধ হয়, আবার নবীন হয়—আবার নবরসে পূর্ণ হয়। মনুষ্য সম্বন্ধে যাহা, দেশ সম্বন্ধেও তাহাই; ইহার একটুও ব্যতিক্রম নাই। পৃথিবীর অবিশ্রান্ত গতিতে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে কোন দেশ ডুবিতেছে, কোন দেশ উঠিতেছে,—কোন দেশের মৃত্যু হইতেছে,—কোন দেশের পুনর্জন্ম লাভ হইতেছে। কালের অনন্ত লীলায় একবার যে দেশ মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিল, সে দেশ সময়ে আবার জীবন লাভ করিতেছে। এই প্রকার জন্ম মৃত্যু যেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিতেছে। একবার ইতালীর উত্থান, আবার পতন, আবার উত্থান। ইতিহাসে যাহা ইতালী সম্বন্ধে ঘটিয়াছে—ইতিহাসে তাহাই হতভাগ্য ভারত সম্বন্ধে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতের স্মৃতি নব্যভারতের এক সম্পত্তি বিশেষ বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের আর কি আছে? সকলেই জানেন—কিছুই নাই। সে গার্গী নাই, সে খনা নাই, সে লীলাবতী নাই, সে সাবিত্রী নাই, সে যুধিষ্ঠির নাই, সে ভীম নাই, সে রামচন্দ্র নাই, সে কণিক নাই, সে চার্ব্বাক নাই, সে কালিদাস নাই, সে আর্য্যভট্ট নাই, সে বরাহমিহির নাই,—সে কালের আশা ভরসা কিছুই নাই। কিছুই নাই—ভারতের পূর্ব্বকাহিনী স্বপ্ন হইয়া অতীত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে;—সে কালের কোন বস্তুর সহিত এক্ষণকার আর সাদৃশ্য নাই। সহস্র বৎসর স্তবস্তুতি করিলেও আর সে সকল ফিরিবে না। সে ভ্রান্ত, যে আজও সেই সকল মায়াময় স্বপ্ন ভারতবর্ষে—এই হিন্দুস্থানে বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেখিয়া ভুলিতেছে। সে কালের কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব্বের সকলই কালের অনন্ত সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে—কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব্ব জীবনী শক্তি যখন একেবারে বিলুপ্ত হইল, যখন একে একে সকল রত্ন ভারত-বক্ষকে শূন্য করিয়া পলায়ন করিল, তখন ইতিহাস-লেখকগণ শোকার্ত্ত-হৃদয়ে চক্ষের জলের দ্বারা ইতিহাসে লিখিলেন—ভারত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সেই হইতে ভারতগগন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল,—সেই

ভীষণ বিভীষিকাময়ী অন্ধকারে হীনচেতা পশু সকল দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল;—কেহ কাহাকে দেখে না—কেহ কাহাকে মানে না;—এই প্রকারে ভারত কতকাল মৃত্যুর করাল কবলে পড়িয়া রহিল। ভারতের দুর্দ্দশার সে কাহিনী কেবা বলিতে পারে, কেবা শুনিতে জানে? সেই সময়ে মৃত-ভারতের ইতিহাস আর কেহ লিখিল না। কত শত বৎসর চলিয়া গেল—দরিদ্র ভারত যে মৃত, সেই মৃত। সকলের আশা-দীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল—ভারত আবার জীবন পাইবে, এ আশা আর কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইল না।

আমরা ভারতের সেই অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া আজ চক্ষের জলে ভাসিতেছি—সকল ঘটনা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে না;—সকল কথা ব্যক্ত করিতে হৃদয় অগ্রসর হইতেছে না। এই মরুভূমিতে আবার সরসী সৃজিত হইবে, অন্ধকার গৃহে আবার উজ্জ্বল আলোক শোভা পাইবে—ভারতে আবার সূর্য্য উদিত হইবে, তখন এ চিন্তা কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস কে দেখিল? সবিস্ময়ে জগত দেখিল—ধীরে ধীরে ভারত-গগনে আবার নবীন সূর্য্য উদিত হইতেছে। ভারত-অন্ধকারে আবার দীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া, সেই সময়ে পৃথিবী কলরব করিয়া উঠিল। ভারত তখন ঐ আলোকের মর্ম্ম কিছুই বুঝে নাই,—ভারতের তখন বুঝিবার শক্তি ছিল না। ভারতভূমির সেই সূর্য্যোদয়ের কাল ইংরাজ-রাজত্বের সময় হইতে গণনা করা যায়। যে কারণেই হউক, ইংরাজ ভারতকে উদ্ধার করিলেন,—ভারতকে জীবিত করিলেন। তারপর কি হইল? সূর্য্য ধীরে ধীরে গগনে উঠিতে লাগিল; যে জাতি শত শত বৎসর অন্ধকারে বাস করিয়া চক্ষুর জ্যোতি হারাইয়াছিল, সেই জাতির আলোক সহ্য হইল না,—তাহারা কলরব করিয়া উঠিল,—অত্যাচার—অবিচার—অধীনতা এই প্রকার কত কর্কশ ধ্বনি আকাশে তুলিতে লাগিল। ইংরাজ-রাজত্বকে দুঃখের বলিতে চাও, বল, কিন্তু ভাই, নিশ্চয় জানিও, ঐ সূর্য্য কখনও এত শীঘ্র ভারত-গগনে উদিত হইত না, যদি ইংরাজ ভারতে পদার্পণ না করিত। যাউক, সে কথায় আজ প্রয়োজন নাই। সূর্য্য ভারতকে আলোকিত করিবার জন্য আসিয়াছিল—আলোকিত করিল। ভারতের সকলে তখন মুখ চেনাচিনি করিতে লাগিল—'জয় ভারতের জয়' এই শব্দ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল,—পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল,—কেহ

বক্ষে আঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল,—কেহ ইংরাজকে তাড়াই-বার জন্য অলীক আশার স্বপ্ন দেখিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। কিন্তু এ সময়ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না;—সৌভাগ্যবশত শিক্ষার সহিত ভারতের উষ্ণরক্ত একটু শীতল হইল;—ভারতবাসী স্বাভাবিক কোমলভাবে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ভারত জীবন পাইলেন; কেবল জীবন নহে, শক্তি পাইলেন;—ভাল মন্দ বুঝিবার জ্ঞান জন্মিল,—নীতির আদর বুঝিলেন। ভারত তখন ইংরাজকে নমস্কার করিতে শিখিলেন,—ভারতের মস্তক নত হইল। এই সময়ে আমরা ভারতকে 'নব্য-ভারত' বলিয়া অভিহিত করিলাম;—পৃথিবীর সভ্য, অসভ্য, অসংখ্য জাতি এই সময়ে ভারতকে একবাক্য 'নব্যভারত' বলিয়া ব্যাখ্যা করিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—সেই প্রাচীন ভারতই যে এই, তাহার প্রমাণ কি?—প্রমাণ চাও?—ভারতের উত্তরদিকে তাকাইয়া দেখ—ঐ হিমালয় অদ্যাবধি মস্তক উত্তোলন করিয়া—আপন বক্ষে স্মৃতির গৌরব-চিহ্ন সকল অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া তোমার কথার উত্তর দিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;—ঐ স্মৃতিময়ী তরঙ্গসঙ্কুল গঙ্গা যমুনা রহিয়াছে;—ঐ কীর্ত্তিময়ী অযোধ্যা রহিয়াছে। আর কি চাও?—ঐ দেখ, ভারতবাসীর হৃদয়ে, সহৃদয়তার উজ্জ্বল অক্ষরে, প্রাচীন ভারতের স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে;—দেখ, ধর্ম্ম-প্রধান প্রাচীন ভারতের দয়া ধর্ম্ম কি প্রকারে নব্যভারতের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে; দেখ, ঐ স্তূপাকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল 'নব্যভারতের' ভাষার সৌন্দর্য্য কি প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছে,—ভাষার মূলে কি প্রকার শক্তি সঞ্চার করিতেছে। সে ভ্রান্ত, যে প্রাচীন ভারতের অসংখ্য প্রমাণ পাইয়াও তাহাকে তুচ্ছ করে—এবং প্রাচীন ভারত যে নব ভূষণে ভূষিত হইয়া পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছে, তাহা যে অস্বীকার করে। ভারত-ইতিহাসের নিগূঢ় অভ্রান্ত সত্য সকলকে যে অস্বীকার করিল, তাহার কি বিড়ম্বনা!!

প্রাচীন ভারতের সহিত নূতন ভারতের কি প্রভেদ, একথার আলোচনায় আমরা অদ্য প্রবৃত্ত হইব না। প্রাচীন ভারত শ্রেষ্ঠ, কি 'নব্যভারত' শ্রেষ্ঠ, সে বিষয় লইয়াও তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা এই মাত্র বলি, সে সময়ের ভাল সেই সময়েই ভাল লাগিয়াছে—আর এ সময়ের ভাল এ সময়েই ভাল লাগিতেছে। কিন্তু একটী কথা আমরা এস্থলে বলিব,

সে সময়ে বাহুবলে যাহা সংসিদ্ধ হইত, এ সময়ে বুদ্ধিবল ও জ্ঞানবলে তাহা সংসাধিত হইবে, আশা হইতেছে। 'নব্যভারত' এখন বুঝিতে পারিতেছেন—নীতিবলের ন্যায় পৃথিবীতে আর বল নাই; পাপের ন্যায় আর ভয়ানক শত্রু নাই। 'নব্যভারত' আর কি বুঝিতে পারিতেছেন?—বুঝিতেছেন—একতাই মানবের মহাশক্তি;—প্রেম একতার মূল সূত্র, নীতি ও পুণ্য একতার প্রাণ;—বুঝিতেছেন—এক সময়ে পৃথিবী হইতে পাশব শক্তির আদর উঠিয়া যাইবে,—নীতির আদর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে;—শোণিতপাত—অত্যাচার—হিংসার চরমফল যুদ্ধবিগ্রহ এক সময়ে পৃথিবী হইতে পলায়ন করিবে। ইহা বুঝিয়া, নব্যভারত দিন দিন সেই বলে বলীয়ান হইতে চেষ্টা করিতেছেন। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, 'নব্যভারত,-ও 'নব্যইতালী' একই প্রকার। আমরা বলি, 'নব্যভারত' ও নব্যইতালী' একপ্রকার নহে। 'নব্যইতালীতে' নীতির আদর থাকিলেও যুদ্ধাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ একেবারে রহিত হয় নাই; কিন্তু যুদ্ধাস্ত্রের সহিত 'নব্যভারতের' কোন সম্পর্ক নাই,—'নব্যভারত' একমাত্র নীতি ও পুণ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃষ্ট করিবে। নব্যভারত জানেন, মানবের শত্রু বাহিরে নয়, তাহা অন্তরের ভিতরে। অন্তরকে পরিশুদ্ধ করিতে পারিলে, বাহিরের সকল শত্রু মিত্র হইয়া যায়। 'নব্যভারত' শরীরের বলের আদর দিন দিন বিস্মৃত হইয়া, জ্ঞানবল ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতেছেন। 'নব্যইতালীর' আবার পতন হইতে পারে,—আবার অত্যাচার আসিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই, 'নব্যভারত' যদি অটলভাবে আপন লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তবে ইহার সে পতনের আর সম্ভাবনা নাই। নির্ব্বোধ ভারতবাসি! কেন বালকের ন্যায় ম্যাট্‌সিনির অভ্যুত্থান কামনা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছ? সময়ের বিশেষ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদকে শিরে ধারণ করিয়া, মাভৈ মাভৈ রবে 'নব্যভারতের' সেবা কর দেখি, নীতি পাও কি না, শক্তি পাও কি না, একতা পাও কি না?

'নব্যভারত' নব বেশে কুসংস্কারের সহিত যুদ্ধ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সময়ে, যদি কেহ, অগ্রসর হইয়া 'নব্যভারতের' গুপ্ত মন্ত্র কি, এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা তাঁহাকে নির্ভয়চিত্তে বলিব,—নব্যভারতের এক হস্তে পবিত্রতা, অন্য হস্তে উদারতা—মস্তিষ্কে জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা,

হৃদয়ে প্রেম,—আর সমস্ত শরীরে ওতোপ্রোত ভাবে মানবের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। 'নব্যভারতের' শক্তির পরিমাণ কে করিতে অগ্রসর হইবে? ভারতের পূর্ব্বস্মৃতি ভারতকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছে,—ঈশ্বর বিশ্বাসই সকল শক্তির মূল। ভারতবর্ষে যাহারা এই মন্ত্র অস্বীকার করিল, তাহারাই পাপে ডুবিল—অত্যাচারে মরিল—পৃথিবীতে কলঙ্কের পূতিগন্ধযুক্ত নিশান তুলিয়া রাখিয়া অপসৃত হইল। 'নব্যভারতে' যদি এ প্রকার লোক থাকেন, তবে 'নব্যভারত' সতর্ক ভাবে, যত্ন সহকারে, প্রেমের দ্বারা তাহাদিগকে আবার লক্ষ্য পথে আনিবেন, একজনকেও অন্য পথে যাইতে দিবেন না। 'নব্যভারত' জানে, শরীরের এক অঙ্গের পতনে অন্য অঙ্গের বল হ্রাস হয়। 'নব্যভারতের' হৃদয়ে ও মনে ঘৃণা থাকিবে না, অহঙ্কার থাকিবে না;—উদারভাবে বিনীত অন্তরে 'নব্যভারত' সকলের সেবা করিবেন। ঠাট্টা, বিদ্রূপে 'নব্যভারত' বিচলিত হইবেন না, নিন্দায় কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইবেন না;—গুপ্ত মন্ত্র সাধনে রত থাকিলে, পৃথিবীর সকলকে তুচ্ছ করিতে পারিবেন। 'নব্যভারত' বিশেষরূপে জানেন, অন্তর ও বাহিরকে এক প্রকার করাতেই মহত্ত্ব,—কপটতা সর্ব্বনাশের মূল,—অন্তরে কিছু না থাকিলে, বাহির-আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া, জগতের প্রশংসা পাইলেই, উন্নতি লাভ করা যায় না।

অনেকের মনে সন্দেহ আছে, 'নব্যভারতের' ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইবে কি না? যে দেশে বহু ভাষা প্রচলিত, সে দেশে এক ভাষা টিকিবে না, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। একথার উত্তর এই—বাঙ্গালা ভাষাই 'নব্যভারতের' ভাষা—আজ না হইলেও কালে হইবে। ভাই, তুমি ইংরাজি ভাষার উন্নতির চেষ্টায় রত হইয়া, দিন দিন উন্নত হইতেছ, তোমার নাম সংবাদ-পত্রে বিঘোষিত হইতেছে, তুমি কি আত্মাভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া কখনও বাঙ্গালা ভাষার গভীরতা অনুভব করিয়াছ?—ইহার উন্নতির পরীক্ষা করিয়াছ?—আর ভারতের সমস্ত ভাষার হীনাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ? যদি তোমার পক্ষে এ সকল সম্ভব হইয়া থাকে, তবে তুমি ভাই, দরিদ্রের এই কথাটীকে স্মরণ করিয়া রাখ,—বাঙ্গালা ভাষাই কালে সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে। যে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীর সহিত একত্রে ছয় মাস কাল-যাপন করিয়াছে, সে হিন্দুস্থানী আর বাঙ্গালীর সহিত হিন্দিতে কথা কহিতে ভালবাসে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভারতের এমন স্থান

নাই, যেখানে বাঙ্গালীর গমন হয় নাই ; সুতরাং ভারতে এমন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন লোক একটু বাঙ্গালা না জানে। তারপর বাঙ্গালা যে ভাষা হইতে উৎপন্ন, ভারতের আর প্রায় সমস্ত ভাষাই সেই মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন ; না হইলেও মূলের সহিত সে সকলের অনেক সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃত ভাষা হইতে যত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অধিক পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে, এবং হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষাতে যত ভাল ভাল পুস্তক আছে, ভারতের আর কোন ভাষাতে তেমন নাই। যে কারণে ইংরাজি ভাষা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই কারণেই বাঙ্গালা ভাষা কালে ভারতের ভাষা হইবে। অবশ্য, তাহা ১০।১২ বৎসরে হইবে না। জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না ; ভারতের সেই পরিমাণে উন্নতি হইবে, যে পরিমাণে ভাষার উন্নতি হইবে। এক দেশে বিভিন্নধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে যেমন একতা অসম্ভব, একদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সেইরূপ একতা অসম্ভব। প্রাচীন ভারতে এক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল বলিয়াই, ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল। এক প্রকার অভাব, এক প্রকার ধর্ম্ম, এক প্রকরে ভাষা, এ সকলই একতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন, ইংরাজশাসনে সমস্ত ভারত শাসিত, এক শাসনাধীন সকলের অভাবই এক প্রকার, অতএব ভারতের একতার জন্য ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতির একরূপ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। পৃথিবীর ইতিহাস তাঁহাদের এ কথাকে নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং আমরা আর এই কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহি না। একতার মূল কি, এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস, ও ভাষা জগতের ইতিহাস সুস্পষ্ট-ভাবে উদাহরণ দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে এ কথা আমরা বলি না যে, পৃথিবীর কোন দেশেই এ সত্য অপ্রমাণীকৃত হয় নাই। এক ধর্ম্ম এবং এক ভাষা প্রচলিত হওয়া সময় সাপেক্ষ, তাহা জানি ; কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ কার্য্য একদিনে সম্পন্ন হয় ? যাঁহারা মানবজাতির অভ্যুদয়ের মূল ইতিহাস নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—এক ধর্ম্ম, এক ভাষা ভিন্ন কখনও কোন দেশে এক হৃদয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যদি ভারতে ইহা অসম্ভব হয়, তবে ভারতে একতাও অসম্ভব। এক খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ইংরাজি ভাষা পৃথিবীর অসংখ্য জাতিকে কি প্রকারে একতাসূত্রে বাঁধিতেছে, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাঁহারা জাতীয় ভাষার উন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতিকে

লক্ষ্য না করিয়া, কেবল রাজনীতির অনুসরণ করিয়া পরানুকরণে রত আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পণ্ডশ্রমে রত দেখিয়া সময়ে সময়ে অশ্রুপাত করিয়া থাকি। আমরা বলি, ভারতে ভাষার একতা এবং ধর্ম্মের একতা সময়-সাপেক্ষ হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে; যদি অসম্ভব হইত, তবে ভারতকে আজ আমরা 'নব্যভারত' নামে অভিহিত করিতে প্রয়াসী হইতাম না। কেহ কেহ মনে করেন, ইংরাজি ভাষাই কালে ভারতের ভাষা হইবে। ইহা মনে করিয়া, অসংখ্য ভারত সন্তান ইংরাজি ভাষার উৎকর্ষ সাধনে জীবন ক্ষয় করিতেছেন,—ঐ ভাষার কাল্পনিক অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে-ছেন। ইহাঁরা জানেন না, জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন ভাষা হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না; হৃদয়স্পর্শী ভাষা না হইলে ছোট বড় সকলে তাহা গ্রহণ করে না। অসংখ্য নর নারী যে ভাষা গ্রহণ না করিল, সে ভাষাও কি জাতীয় ভাষা—একতার ভাষা হইতে পারে? এই জন্য আমরা বলি, ইংরাজি ভাষা, নব্যভারতের শিক্ষার বস্তু হইলেও, সাধারণের হৃদয়স্পর্শী নহে—সুতরাং একতার মধ্যবিন্দু হইবে না। সোজা কথায় সোজা ভাব ব্যক্ত করা মানবের স্বভাব। এই জন্য আমরা মনে করিয়া থাকি, যাঁহারা ইংরাজির উন্নতি-চর্চ্চায় রত আছেন, তাঁহারা কেবলই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করিতে-ছেন। এই কাল্পনিক পথ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা যদি জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধানে রত হইতেন, তবে ভারতের কত অভাব দূর হইত। বাঙ্গালা ভাষা অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই ভাষাই যে কালে ভারতের ভাষা হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্ত-মান সময়েই বাঙ্গালা ভাষার কোন কোন পুস্তক ভারতের অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরিত হইতেছে। কেবল অনুবাদে যখন লোকের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবে না, তখন এই ভাষা শিক্ষা করিতে সকলেরই ইচ্ছা হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা কালে কেবল বঙ্গদেশেই ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবেনা;—ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন ভারতে একতা অসম্ভব। এই জন্য আমাদের বিশ্বাস, ভারতের ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইবে, কালে এই হৃদয়স্পর্শী ভাষা ভারতের নরনারী সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করিবে,—কালে সকলের মুখেই এই এক ভাষা শ্রুত হইবে। ভারতের এই অভিনব ভাষা ভারতকে সজীব করিবে—এক করিবে, সকলকে প্রাণে প্রাণে মিলাইবে।

আর একটী কথা বলা হইলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। 'নব্যভারতের' কাল দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ধরা যায় কি না? আমরা বলি, তাহা যায় না। যখন সুপ্তোত্থিত ভারতবাসী ইংরাজকে অন্তরে অন্তরে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার কামনা করিত, মুখে 'ভারতজয় ভারতজয়' গান করিয়া সুখ পাইত, বিদ্যাশিক্ষাকে চাকরী বা দাসত্বের কেন্দ্র বলিয়া তাহার অনুসরণ করিত, স্ত্রীশিক্ষাকে ঘৃণা করিত, বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত, পরানুকরণে জীবনকে ডুবাইয়া সুখী হইত, ধর্ম্মের নামে উপহাস না করিয়া জলগ্রহণ করিত না, একজন আর একজনকে কাঁদিতে দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিত না, ভারতবাসী দেশহিতৈষী নাম গ্রহণ করিত কেবল যশমানের জন্য, পরোপকার করিত ইংরাজের কৃপা পাইবার জন্য—এবং ভাই ভাই কাটাকাটী করিয়া মরিত, সে সময়কে 'নব্যভারতের' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে আর ভারতের সে সময় নাই, এখন ভারত জাতীয় ভাবের ও জাতীয় ভাষার আদর শিখিতেছেন,—এক হৃদয়ের দুঃখে অন্য হৃদয় কাঁদিতেছে; জাতিভেদকে সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া বুঝিতেছেন, স্বাধীনতার আদর বুঝিতেছেন, জ্ঞানের মর্য্যাদা ও বিদ্যার জন্য বিদ্যার আদর করিতে শিখিতেছেন। আর মুখে 'জয় ভারতের জয়,' বলিয়া ইংরাজকে তাড়াইতে ভারতবাসীর ইচ্ছা নাই;—এক্ষণে ভারতবাসী বুঝিতেছেন—আরও অনেক কাল ইংরাজের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। ভারতবাসী এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার আদর বুঝিতেছেন, ধর্ম্মের নামে আর উপহাস করিতে ইচ্ছা নাই,—কাহারও কৃপা পাইবার জন্য, বা যশের জন্য পরোপকার করাকে ঘৃণার কার্য্য বলিয়া বুঝিতেছেন। এক্ষণে বিদ্যা শিখিয়া ভারতবাসী দেশের উপকার করিতে ধাবিত হইতেছেন;—বিলাত হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতে আসিয়া জাতীয় ভাব ও ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। এই সময়ে ভারতের যে কি এক অপরূপ শোভা হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। এই অভিনব সময়কেই আমরা 'নব্যভারতের' সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। স্বায়ত্ত-শাসনের আন্দোলনে ভারত দেখাইয়াছেন, ভারত রাজনীতি চায়,—ভারত একতার জন্য উৎসুক। ফৌজদারী কার্য্যবিধির বিল সম্বন্ধীয় আন্দোলনে, ভারত দেখিয়াছেন, ভারতকে আর পদতলে রাখিতে উদার চেতা ইংরাজগণের ইচ্ছা নাই,—ভারতও নানারূপে দেখাইতেছেন, ভারত আর বিচ্ছিন্ন নয়—একের

সুখে অন্যের হৃদয় প্রফুল্ল হয়, একের দুঃখে অন্যের হৃদয় ব্যথিত হয়। ভাষার আদরের সহিত সংবাদপত্রের আদর বাড়িতেছে, ভারত আলস্য পরিহার করিয়া কার্য্যদক্ষ হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রজা ভূম্যধিকারী-আইনের আন্দোলনে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ভারতে দুঃখী প্রজাদের জন্য কাঁদিবার অনেক লোক আছে। আরও অসংখ্য কারণে আমরা উদার-চেতা মহামতি লর্ড রিপণের শাসন কালকেই 'নব্যভারতের' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। ইহাঁর ন্যায় উদারনৈতিক শাসনকর্ত্তা আর কখনও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। ইনিই যেন ভারতকে নবভূষণে সাজাইয়া তুলিতেছেন। ইহাকে ভারত কখনও ভুলিতে পারিবে না। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, স্বাধীনতা, পবিত্রতা ও উদারতা নব্যভারতের মূল-মন্ত্র থাকুন;—একতা—শান্তি এবং সাম্য ইহার চরম লক্ষ্য হউক। এই মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য চিরকাল প্রাণে থাকিলে কখনই নব্যভারতের অবনতি হইবে না।

## নিরাকারের ধ্যান।

নিরাকারের পূজা সম্ভব কি অসম্ভব, এই কথা লইয়া বঙ্গপ্রদেশে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা এক নিরাকার ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহারা অবশ্য নিরাকারের পূজাই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মধ্য হইতে একদল পণ্ডিত উঠিয়া তাহার প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন, পৌত্তলিক দেবদেবীর পূজা প্রচার করিয়া আপনাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। সাধারণ লোকমণ্ডলী উভয় সঙ্কটে পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া কেহ বা ধর্ম্মরাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, কেহ বা সুবিধামত যে কোন দলে যোগদান করিতেছেন। দলাদলীর ইতিহাসের এক অভিনব পরিচ্ছেদ বঙ্গপ্রদেশে অভিনীত হইতেছে। কোন্ কথা সত্য, ইহা আলোচনায় সক-লেরই অধিকার সমান। এ সম্বন্ধে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, বলিতেছি।

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকেই কতকগুলি শক্তি দিয়াছেন। শক্তি দরিয়াছেন এবং তাহা পরিচালনার উপযুক্ত স্থান দিয়াছেন। ঈশ্বর-দত্ত অধিকার মান-বের চির-সম্পত্তি;—তাহা যত দিন আছে, মানুষ ততদিন আপনার পায়ের

উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেই থাকিবে। শক্তিগুলি আপন অধিকারক্ষেত্রে উপযুক্ত রূপ পরিচালনা করিয়া করিয়া দিন দিন উন্নত হইতেছে। একদিন যে শক্তির কেবল অঙ্কুর মাত্র শিশু-মানবে ছিল, তাহাই কাল-সহকারে কত বড় হইয়াছে। জরায়ু গর্ভের ভ্রূণ আর বিশ বৎসরের যুবক, উভয়কে চিন্তা কর, মানবের শক্তির কত উন্নতি হইয়াছে, বুঝিতে পারিবে। প্রকৃতির শক্তি, মানবের শক্তির বিকাশে প্রায় সর্ব্বদাই সহায়তা করিতেছে; কিন্তু কখনও কখনও মানুষ আর প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইতেছে,—জল বায়ু কখনও কখনও মানবের শক্তিস্বাধীনতায় বাধা দিতেছে। তখনই তুমুল সংগ্রাম বাধিতেছে। বাহিরের বিষ যখন মানব-শরীরের শক্তি-বিকাশের প্রতিবন্ধক হইয়া শরীরে ঢুকিল, তখনই শরীর-নিহিত আর এক শক্তি তাহাকে বাহির করিয়া দিতে অবিরত চেষ্টা করিতে লাগিল। শরীরাভ্যন্তরের কীট সকল বিষম বাধা দিয়া থাকে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, রোগের সময় শরীরের স্বাভাবিক শক্তি, অনেক স্থলে, বিষকে বাহির করিয়া দিতে পারে। যে দ্রব্যে শরীরের অপকার হইবে, তাহা আহার কর, দেখিবে, যতক্ষণ তাহা বাহির না হয়, ততক্ষণ আর শরীর সুস্থ হয় না; ভেদ, বমি, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম, এই সকল উপায় দ্বারা সেই বিষকে বাহির করিয়া দিবেই দিবে। অস্ত্র দ্বারা হাত কাট, কিয়দ্দিবস পরে দেখিবে, আপনা আপনি তাহা যোড়া লাগিয়া যাইবে। রোগ আর কিছুই নহে, ভিতরের শক্তির সহিত প্রকৃতির বিরোধী শক্তির সংগ্রাম মাত্র। প্রকৃতির শক্তির সহিত সংগ্রামে, শরীরের শক্তি যখন পরাস্ত হয়, তখনই ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়; নচেৎ নহে। এ গুলি বিজ্ঞানের অভ্রান্ত সত্য। মন সম্বন্ধেও কতকগুলি অভ্রান্ত সত্য আছে। মানসিক উন্নতির সহায়তার জন্য প্রকৃতিতে অনেক পদার্থ রহিয়াছে। সেই সেই পদার্থ সকল অবিরত মানব-মনের উন্নতির সহায়তা করিতেছে; কিন্তু কখন কখন প্রতিরোধও করিতেছে। যখন প্রতিরোধ করিতেছে, তখনই মন আপন বীরত্ব লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে। কখন মানসিক শক্তি পরাস্ত হইতেছে, কখনও বা প্রকৃতির শক্তি পরাস্ত হইতেছে। যখন মানসিক শক্তি পরাস্ত হইতেছে, তখন মানুষ প্রকৃতির নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া আপন উন্নতির ব্যাঘাত করিতেছে। কিন্তু অনেক সময়েই মন আপন পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। বিরোধী শক্তির অত্যাচার,

মানব-শরীরই বল, কিম্বা মনই বল, ইহারা কেহই সহ্য করিতে পারে না। নিগূঢ়রূপে প্রকৃতির সকল বিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, মানুষ স্বাধীন, কোন প্রকার অধীনতা তাহার অসহ্য। স্বাধীনতার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকই সে সহিতে পারে না। স্বাধীনতা কাহাকে বলে?—যে শক্তি মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। আপনার বিশেষ বিশেষ পথে হাটিতেই মানুষ লালায়িত। প্রতিরোধ, অবরোধ সে সহিতে পারে না। পৃথিবীতে যত রোগ, যত ধর্ম্মযুদ্ধ, এ সকলই স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকের চরম ফল। মানুষ কেন স্বাধীনতার জন্য লালায়িত? কারণ, ইহাই উন্নতির একমাত্র সহায়, বিশেষত্ব-লাভের মূল সোপান।

শক্তি-বিকাশের ক্ষেত্র কি, তাহা প্রত্যেক মানুষেরই বুঝিবার শক্তি আছে। স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই সকলে আপন আপন লক্ষ্য, আপন আপন পথ বাছিয়া লইতে সক্ষম। ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তি সকলেরই আছে, সকলেই ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে পারে। এমন এক শক্তি মানুষের ভিতরে আছে, যে অবিরত মঙ্গলের পথ মানুষকে দেখাইয়া দিতেছে। সকল সময়েই সে শক্তির স্পষ্ট আদেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। দক্ষিণে যাইব, কি বামে যাইব? জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাইবে। ছোলার ডাইল খাইব, কি মশুরির ডাইল খাইব? লোভ ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা কর, স্পষ্ট উত্তর পাইবে। এটী ধর্ম্ম, কি ওটী ধর্ম্ম? জিজ্ঞাসা কর, স্পষ্ট উত্তর শুনিতে পাইবে। সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বুঝিবার যে ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি মানবের সহায়, সেই শক্তি না থাকিলে আজ পৃথিবীতে সত্য অসত্য, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম লোকে বাছিয়া লইতে পারিত না। এই যে শক্তি মানবের প্রাণে, যাহাকে ভাষায় বিবেকশক্তি বলা যায়, এই শক্তি অনবরত মানুষকে আপন আপন বিশেষত্বের পথে লইয়া যাইতেছে। প্রত্যেককে বিশেষ বিশেষ পথে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেকের আবিষ্কৃত সত্যে ঘনীভূত মিলন দেখা যাইতেছে। এই জন্য পণ্ডিতেরা ঠিক করিয়াছেন, ঈশ্বর-বাণী বিবেকের কথা সকলের একরূপ—বিবেকের আবিষ্কৃত পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সত্য একরূপ। কিন্তু অনেক স্থানে সামান্য সামান্য বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সে সকল বিবেকের কথা নহে; সে সকল ব্যক্তিগত ভাবের অর্জ্জিত ফল মাত্র। যে সকল কথা এখানে থাকুক। বিবেক মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন, বিশেষ বিশেষ পথে লইয়া যাইয়া আবার একস্থানে মিলাইতেছে। পথে হাঁটিবার সময়ে বিভি-

মন্তা দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু লক্ষ্য স্থানে যাইয়া দেখা যাইতেছে, সকলই এক স্থানে আসিয়াছে। আপন আপন পথে, বিবেকের কথা মতে চলিলে, মানবের কখনও বিচ্ছেদ বা অমঙ্গল ঘটে না। শিক্ষা, অবস্থা ও জল বায়ু-অর্জ্জিত ব্যক্তিত্ব বিবেকের স্থানকে অধিকার করিলেই মানবের অমঙ্গল ঘটে; নচেৎ বিবেক মানবকে বিভিন্ন পথে চালাইলেও পরিণামে একই লক্ষ্যে উপস্থিত করিবে। বৈষ্ণব শাক্ত, খ্রীষ্টীয়ান মুসলমান, ব্রাহ্ম বৌদ্ধ, সকলকেই একস্থান মিলাইবে। কিন্তু মানুষের এই যে বিবেকের স্বাধীনতা, পৃথিবীর লোকেরা, গুরুগিরি বজায় রাখিবার জন্য, এই স্বাধীনতাকে অপ-হরণ করিয়া বড়ই গণ্ডগোল বাধাইয়া দিতেছে। ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্ম আনি-তেছে, পুণ্যের স্থানে পাপ-গরল উৎপন্ন করিতেছে। করিতেছে, কিন্তু তবুও ধর্ম্মের জয় হইতেছে—বিবেকের জয় হইতেছে,—মানবের আবিষ্কৃত সত্যে, ঘনীভূত মিলন দেখা যাইতেছে। মানুষ পৃথিবীর অর্জ্জিত ব্যক্তিগত ভাব পরিত্যাগ করিয়া, আপন বিবেকের কথা মতে চলিয়া, যদি প্রাণগত বিশ্বা-সের সহিত মাটীকে শক্তির অবতার বলিয়া বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিতে পূজা করে, তবে তাহাতেও তাহার অমঙ্গল নাই। কারণ, অনাবিল প্রেমভক্তির পথে চলিতে চলিতে, শেষে, সাধক রামপ্রসাদের ন্যায়, তাহাকে নিরাকার শক্তি-সিন্ধুর নিকটে আসিয়া মস্তককে অবনত করিতেই হইবে। কিন্তু শিক্ষা,সমাজ, অবস্থা যদি তাহাকে ঐ জ্ঞানে উপস্থিত করিয়া থাকে, তবে তাহার অমঙ্গল ঘটিবে। কারণ বিবেক তখন মলিন হইল। সংসারের লোকের কথায় ধর্ম্ম হয় না, বিবেক-বাণীকে আধিপত্য না দিলে, ধর্ম্ম টিকে না। ধর্ম্ম পলায়ন করিলে, মানবের মঙ্গল আর কোথায় রহিল? মানুষ আপনার প্রাণগত বিশ্বাসে যদি সৃষ্ট কোন পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে প্রেমভক্তিতে পূজা করে, তবে তাহার অমঙ্গল হইবে না; কিন্তু যে জন কাহারও কথা মতে করে, তাহার অমঙ্গল হইবেই; কারণ সে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইল। স্বাধীনতা ভিন্ন মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের আর নেতা নাই। স্বাধীনতার মূলশক্তি বিবেক। আপন বিবেকের কথায়, যে ব্যক্তি পৌত্তলিকতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পুতুলকে ভালবাসিতে পারিয়াছে, তাহার অমঙ্গল নাই। ঈশ্বরের কৃপায়, এক প্রেমের বলে, ধর্ম্মের পথে সে অটল থাকিতে পারিবে—সংসা-রের পাপ প্রলোভন—অমঙ্গল, তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। কিন্তু অর্জ্জিত বিশ্বাসে যে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়, তাহার পদে পদে বিপদ ঘটিবে।

ভিতরের জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রেম ভিন্ন, মানুষ দৃঢ় ও অটল থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর-জ্ঞান এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি, স্বতই, মানবের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীর আদি সময় হইতেই এই জ্ঞান, এই ভক্তি ছিল। এ জ্ঞান, এ ভক্তি, অর্জ্জিত নহে। এই জ্ঞান ও এই ভক্তির অঙ্কুর আদি সময় হইতে মানবের অন্তরে নিহিত দেখিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাপণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া গিয়াছেন। আদি সময় হইতে ঈশ্বরের সত্তাবোধ (Consciousness of God ) যদি মানবের প্রাণে না থাকিত, তবে মানুষ কখনও ধর্ম্মের নামে মাতিত না। এই সত্তাবোধের পথ, বিবেক সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে। এই জন্যই আজও, পৃথিবী, সকল শক্তির পরাক্রমকে পরাজয় করিয়াও, প্রেম-পুণ্যের বিজয় নিশান, অপ্রতিহত প্রভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছে। এই যে ঈশ্বরের সত্তারোধ, ঈশ্বরবোধ, ইহা কি প্রকার, ক্রমে লিখিতেছি।

মানুষ আকার-বিশিষ্ট, আবার মানুষ নিরাকার,—আকারে নিরাকার, নিরাকারে আকার। হস্ত-পদ-বিশিষ্ট মানুষ আকার-বিশিষ্ট; আবার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ভক্তি প্রভৃতি বিভূষিত মানব নিরাকার। শরীর আকার-বিশিষ্ট, আত্মা ও মন নিরাকার। শরীরে আত্মা, আত্মায় শরীর। পৃথিবীতে এই আকার ও নিরাকারের এমনই যোগ, একের রোগে অপরকে আক্রমণ করে। শরীরের পীড়ায় মনের ধারণা শক্তি হ্রাস হয়; মনের পীড়ায় শরীর শুষ্ক হয়, বল হ্রাস হয়। এই যে যোগ, এ এক মহাযোগের মিলন। মানুষ মানুষের আর কিছুই ভাবিতে পারে না, ভাবে কেবল—শক্তি—কেবল গুণ। এই যে আকার-বিশিষ্ট নিরাকার মানুষ, ইহার শরীর জড় বস্তুর সমষ্টি; কি ভাব ত জড় কি? জড়ের বিস্তৃতি, রূপ, গন্ধ, পরিমাণ প্রভৃতি যাহা ভাবিবে, সে সকলই নিরাকার। ভাবে যে, সে আপনিই নিরাকার; এই জন্য ভাবে যাহা, তাহাকেও নিরাকার করিয়া নিরাকার আত্মা চিন্তা করে। বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে—কিন্তু জড়ের গুণ ভিন্ন বিজ্ঞান আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই। গুণ নিরাকার। আকারকে নিরাকার করিয়া, নিরাকার মানুষ, চিন্তা করিতেছে, ধারণা করিতেছে। চিন্তা কর, বুঝিবে, গুণ ভিন্ন জড়ের আর কিছুই বুঝিবার শক্তি নাই। মায়াবাদীরা এই জন্য জড়ের খেলাকে ভোজের বাজির ন্যায়

মনে করেন। বাস্তবিক জড়ের ভিতরে এক মহাশক্তির ঢেউ প্রবাহিত, তাহাকে নিরাকার বই আর কিছুই ভাবা যায় না।

অনেকে বলেন, নিরাকার আকারের মধ্যেই প্রকাশিত; জড় না থাকিলে নিরাকার ভাবা যাইত না। কোন অবস্থায় ভাবা যায় কি না, জানি না; কিন্তু এই শরীরধারী মানুষ যে পারে না, তাহা নিশ্চয় অনুমান হয়। কারণ, নিরাকারে আকার ব্রহ্মাণ্ডময় দেখিতেছি;—ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা ভিন্ন এই পৃথিবীতে নিরাকার গুণ-ধারণার শক্তি আত্মার দেখিতেছি না। আকার বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা, নিরাকার আত্মা, জ্ঞান, প্রেম লাভ করিতেছে। আবার যাহার মধ্য দিয়া সে জ্ঞান পাইতেছে, সেই সকলই আকার-বিশিষ্ট। শক্তির পরিচয় পাইতেছি—আকারের মধ্য দিয়া। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, পাইতেছি যাহা, তাহা নিরাকার; পাইতেছে যে, সেও নিরাকার। নিরাকার আত্মা আকারের মধ্য দিয়া নিরাকারকে ভাবিতেছে। মানুষ মানুষকে ভালবাসে। কি ভালবাসে?—আকারকে, না গুণকে? আকার-সমষ্টির গুণকে ভালবাসে। গুণ-শূন্য আকার কল্পনাও করা যায় না। গুণ-শূন্য আকার মানুষের ভালবাসা পায় না। যাহা কিছু এই পরিদৃশ্যমান জগতে দেখা যায়, এ সকলেরই গুণকে মানুষ ভালবাসে। গুণ আপনি নিরাকার। চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে, আকারের ভিতর দিয়া মানুষ কেবলই নিরাকারকে ধরিতেছে। আকার কৈ—আকার কোথায়? সকলই নিরাকার—সকলই গুণের সমষ্টি মাত্র;—সকলই শক্তির অলক্ষিত তরঙ্গ মাত্র। পৌত্তলিক, আকার ভাব ত দেখি? সে সাধ্য নাই। আকার দেখিতেছ বটে, কিন্তু প্রাণে যাহা পাইতেছ, তাহা নিরকার; যাহা ভাবিতেছ, তাহা নিরাকার; প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাকে মন্দিরে আনিতেছ, তাহা নিরাকার; যাহার অবর্ত্তমানে মাটীর পুতুলকে জলে ভাসাইতেছ, তাহা নিরাকার। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিব, আকারের ভিতর দিয়াই নিরাকারের জ্ঞান পাইতেছি। চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ নদী, সাগর উপসাগর, ফল ফুল, ভিন্ন ভিন্ন আকার ধরিয়া কেবলই নিরাকারের শিক্ষা দিতেছে। সৃষ্টি-সিন্ধুকে মন্থন করিয়া কেবল নিরাকার গুণের শিক্ষা পাইতেছি। অনন্ত সৃষ্ট পদার্থ, অনন্ত রূপ ধরিয়া, মানুষকে কেবল অনন্ত নিরাকার গুণ শিক্ষা দিতেছে। যদি বল, যাহার মধ্যে যে গুণ পাইলাম, তাহাকে সেই গুণের জন্য পূজা করি। সে প্রকার শক্তির পূজা সকলেই

করিয়া থাকে, চিরকাল করিবে। কিন্তু এক বস্তুর মধ্যে অনন্তের সকল গুণ কখনই পাইবে না। সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেক বস্তু বিশেষ বিশেষ শক্তির বিন্দু। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থকে পূজা করিতে চাও, কর, কিন্তু একটীকেও যদি পরিত্যাগ কর, তোমার পূজা অসম্পূর্ণ থাকিবে। সকল জড়জগৎ মন্থন করিয়া যত শক্তি পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্ত গুলিকে যদি এক স্থানে একত্রিত করা যাইত, তবে পূজার বড়ই সুবিধা হইত। কিন্তু অনন্ত শক্তি অনন্ত গুণরাশি কোন সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ হয় না। মানুষ আপনিই পরিমিত, সীমাবিশিষ্ট, অসীমের বিন্দুকণা ভিন্ন তাঁহার নিজের ধারণা করিবার কোন শক্তিই নাই। পৃথিবীর কোন পরিমিত পদার্থ অনন্তের ভাবে পূর্ণ হইতে পারে না।

এখন কেহ যদি মনে করেন, এক খানি দশভুজা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে সকল শক্তি আছে, ইহা কল্পনা করিয়া লইলেই হইল। জড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও নিরাকার গুণ, এখানেও নিরাকার গুণ কল্পনা করিব। প্রকৃত পক্ষে ইহা কি সম্ভব? কল্পনায় কি পূজা হয়? পূজার উপকরণ প্রেমভক্তি যাহা কিছু, কল্পনায় তাহার কিছুই হয় না। কল্পনায় ভক্তি হয় না, কল্পনায় ভালবাসা হয় না, কল্পনায় বিস্ময় হয় না। কল্পনা কর, তুমি যেন অকূল সাগরে ডুবিতেছ, করিয়া দেখ ত, মনে ভয় হয় কি না? কল্পনা কর—যেন তোমাকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিতেছে; দেখ ত প্রকৃত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে কি না? কল্পনা কর, তোমার মৃত পিতা তোমার সম্মুখস্থিত গৃহের দেয়ালে বর্ত্তমান, দেখ ত দেওয়ালকে ভালবাসিতে পার কি না? কল্পনা কর, তোমার যেন একটী পুত্র জন্মিয়াছে, দেখ ত প্রকৃত পুত্র-স্নেহের উদয় হইয়াছে কি না? কল্পনা কর, চৈতন্যের ভ্রাতৃ-ভাব তোমার গৃহ পালিত কোন পশুতে আবির্ভূত, দেখ ত সেই পশুকে ভক্তি করিতে পার কি না? কল্পনা কর, এক অকূল আলোক-সমুদ্র হইতে অপূর্ব্ব বেগে এক আশ্চর্য্য জ্যোতি নামিতেছে, দেখ ত, মনে বিস্ময় হই-তেছে কি না? কল্পনায় এ সকল হয় না। প্রকৃত ঘটনা-পরীক্ষা ভিন্ন, ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির উদয় হয় না। আগুনের দাহিকা শক্তি যে কখনও পরীক্ষা করে নাই, সে আগুনের ঐ শক্তিকে কখনই কল্পনা করিতে পারে না। এই প্রকার জগতের সকল শক্তি। প্রত্যক্ষীভূত না হইলে কোন শক্তিরই অস্তিত্ব কল্পনায় ধারণা হয় না। চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ যে

না দেখিয়াছে, সে কখনও উহা ধারণা করিতে পারিবে না। দেখিয়া, পরীক্ষা করিয়া, তবে ধারণা হয়। এক পদার্থের শক্তি অন্য পদার্থ দেখিয়া ধারণা হয় না। বৃক্ষের যে শক্তি, জলে তাহা ধারণা হয় না, আগুনে যে শক্তি, ফুল দেখিয়া তাহা ধারণা হয় না। পক্ষান্তরে, অনন্তপদার্থপুঞ্জকে পরীক্ষা করিয়া, অনন্ত শক্তির ধারণা করা, সীমাবদ্ধ মানবের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। মানব যতই পরীক্ষা করুক না কেন, চিরকালই অশিক্ষিত। এই জন্য, এক প্রতিমায় অনন্ত শক্তিকে কল্পনা করিতে পারা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্যত্র যে মানুষ শক্তির বিকাশ দেখিয়াছে, কেবল সে শক্তির কতক কল্পনা করিতে পারিলে পারিতে পারে, কিন্তু অন্যে তাহা কখনই পারিবে না। অন্যের নিকট প্রতিমা যে বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত, তাহারই গুণ প্রকাশ পাইবে; তাহাতে যাহা নাই, তাহা কখনই ধারণা হইবে না। লোকে অন্যত্র যে শক্তির পরিচয় পাইয়াছে, সে শক্তিকে প্রতিমায় কল্পনা করিয়াও, তাহাকে প্রেমভক্তিতে পূজা করিতে পারে না; কারণ কল্পনায় প্রেমভক্তির উদয় হয় না।

কোন এক সীমাবদ্ধ স্থানে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান কখনই থাকিতে পারে না। এই জন্য, সৃষ্ট পদার্থের সকলের মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ নহে; মানুষ নহে, পশু নহে, পক্ষী নহে, চন্দ্র নহে, সূর্য্য নহে। সীমাবদ্ধ যে, সে কখনই অনন্তের পূর্ণত্ব ধারণ করিতে পারে না। বিন্দু কখনও সিন্ধুকে ধরিতে পারে না। এই জন্য একথা ঠিক, মানুষ কখনই অনন্ত ঈশ্বরকে হৃদয়ে পূর্ণ ভাবে ধারণা করিতে পারিবে না; কিন্তু সিন্ধুর এক বিন্দু অবশ্য ধারণ করিতে পারিবে। সমুদ্রে অগাধ জল, আমার যেমন পাত্র, আমি তেমনি তুলিতে পারিব, এ শক্তি আমার আছে। পাত্রানুসারে মানুষ শক্তি-সাগরের বিন্দু বিন্দু ধরিতেছে। মানুষ জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতার বিন্দু পরিমাণে অধিকারী হইতেছে; কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ কিছুই মানুষ কখনও পায় নাই, কখনও পাইবে না। এই জন্য, একজন মানুষ আদর্শ নয়, একটী কোন বস্তুই আদর্শ নয়। আদর্শ নয় বলিয়া, তাহাতে কিছুই নাই, এমন কথা হইতে পারে না। সমস্ত সাগরকে গণ্ডূষ করিয়া শুষিতে পারি না বলিয়া, এক বিন্দু জল পান করিতে পারি না, তাহা নহে। বিন্দু বিন্দু করিয়াই মানুষ শক্তি পান করিতেছে;—যত পান করিতেছে, ততই তৃষ্ণা বাড়িতেছে, সুতরাং ক্রমেই অধিক পান করিতেছে।

পান করিতে করিতে ছুটিয়াছে,—অনন্তের মধ্যে ডুবিতে। পৃথিবীর প্রথম দিন হইতে এমনি করিয়া অনন্তের বিন্দু বিন্দু লোকে ধারণা করিতেছে। কল্পনা নহে, কথার কথা নহে, মানুষ বাল্যকাল হইতে শক্তি লইয়া খেলা করিতেছে, বাল্যকাল হইতে নিরাকারের শিক্ষা পাইতেছে। গুণসমষ্টি জ্ঞান হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, সেখানে ভাব হইয়া জমাট বাঁধিয়া থাকিতেছে। মানুষ এমনি করিয়া কত জ্ঞান পাইয়াছে,—সেই জ্ঞান পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পৃথিবীর সন্তানেরা আবার ভোগ করিতেছে। কিন্তু তবুও অনন্তের কূল পাইতেছে না। কত বৎসর গেল, কত শতাব্দী গেল, তবুও যেই অকূল, সেই অকূলই রহিল। অকূলে পড়িয়া মানুষ কত হাবুডুবু খাইল, তবুও তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিল না। অনন্ত শক্তি-সাগরকে অতিক্রম করিতে কে পারিবে? সীমাবদ্ধ জীবের তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। নিরাকার মানুষ জড় দেখিয়া নিরাকার জ্ঞান লাভ করিতেছে, জড়ের শক্তি দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইয়া নিরাকার ভাব সঞ্চয় করিতেছে। যাহা প্রত্যক্ষ পাইতেছে, কল্পনায় কখনই তাহা পাওয়া যায় না। ভবের হাট হইতে মানুষকে স্থানান্তরিত করিতে যদি মানুষের শক্তি থাকিত, তবে বুঝিতে পারিতে, মানুষ কল্পনা করিয়া কিছুই পাইত না। নিরাকার আত্মা কেবল নিরাকার লইয়া সর্ব্বক্ষণ মত্ত রহিয়াছে। সীমাবদ্ধ জীব কেবলই অনন্ত ভাব-সাগরের কল কল নিনাদ শ্রবণ করিতেছে। আকার নাই, কল্পনা নাই, সকল মিলিয়া মিশিয়া এক নিরাকার শক্তি-সাগর। তাহার কতই বিচিত্র তরঙ্গ, কতই বিচিত্র বুদ্‌বুদ্। মানুষ তাহাই বাল্যকাল হইতে ভাবিতেছে, তাহাই দেখিতেছে, তাহাকেই বিস্ময়-পূর্ণ ভক্তিতে পূজা করিতেছে। মূর্খ মানুষ, আকারের পূজার কথা লইয়া কি যুক্তিশূন্য তর্ক করিতেছ? একবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হও, বুঝিবে. প্রত্যক্ষ ভিন্ন কল্পনায় কোন জ্ঞান, কোন শক্তির ভাবই ধারণা হয় না; বুঝিবে, আকার আকার নহে, সকলই নিরাকার। জড় জড় নহে—নিরাকার শক্তির তরঙ্গ মাত্র। জড়ও শক্তি, আমিও শক্তি, তুমিও শক্তি। শক্তি-সাগর, অনন্ত নিরাকার। সেই সাগরের বুদ্‌বুদ্, সমস্ত সৃষ্ট বস্তু। সেই নিরাকারের ধ্যানেই মানুষ নিমগ্ন,—তাঁহার ধ্যানেই বিভোর, তাঁহার জ্ঞানেই উন্মত্ত। বিবেক অবিরত মানুষকে এই কথাই বলিতেছে। বিবেক নিয়ত মানুষকে এই নিরাকার ধ্যানের পথেই টানিতেছে। প্রকারান্তরে ইহাকেই স্পেন্সার ( Consciousness of God)

ঈশ্বরের সত্তাবোধ বলিতেছেন। ইহা আদিতে ছিল, ইহা শেষেও থাকিবে। মূর্খ মানুষ যতই অহঙ্কারী হউক না কেন, নিরাকারের ধ্যান পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিবার কাহারও শক্তি নাই। সকল চূর্ণ হইয়া গেলেও মানুষ নিরাকারের পূজা, নিরাকারের ধ্যান ছাড়িতে পারিবে না। কারণ ইহাই আরম্ভ, ইহাই শেষ।

## নিরপেক্ষ-সাধন।

পরমুখাপেক্ষী না হইয়া মানুষ কার্য্য করিতে পারে না, এই জন্যই পৃথিবীতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ব্যক্তিত্ব যখন লোকের স্বাধীনতা হরণ করে, তখনই ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা মানব প্রাণে স্থান পায়। প্রতিভাপূজা, জগতের সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, বর্ত্তমান ছিল। যে ব্যক্তি জ্ঞানে, বিদ্যা বুদ্ধিতে বা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ, সমাজে সেই পূজ্য। মানুষ তাঁহাকে অনুকরণ করিতে সর্ব্বদাই উল্লসিত। ভাল মন্দ বিচার নাই, তাঁহার মধ্যে যাহা ছিল, সেই সকলই অলক্ষিত ভাবে, অন্য হৃদয়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িল। এক জনের জ্ঞানের সঙ্গে, এক জনের কুজ্ঞানও এইরূপে পৃথিবীতে কত জনের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কুসুমের সহিত কীটও শিবপূজায় চলিয়া যাইতেছে। মানবের উচ্চভাবের সহিত সঙ্কীর্ণতাও পৃথিবীতে সংক্রামিত হইতেছে। পবিত্র, সংস্কৃত, সার্ব্বভৌম, উদার ধর্ম্মমতে এইরূপে ব্যক্তিত্ব মিশিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। কখনও কখনও বা এমনই হইতেছে, মানুষ একে অপরের ভাল ভাব হইতেও গরল বাহির করিয়া পান করিয়া মজিতেছে। এই সকল বিষয় একদিন বসিয়া ভাবিতেছিলাম। ভাবিতে-ছিলাম, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় সোণার পৃথিবী টলমল করিতেছে। উদার গৌরের সোণার নদিয়া ছারখার হইতেছে। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। অন্যের স্বাধীনতা বিনাশ করিবার জন্য সকলেই লালায়িত। খ্রীষ্টিয়ান হিন্দুকে নিন্দা করিতেছে, হিন্দু খ্রীষ্টিয়ানকে ঘৃণা করিতেছে, মুসলমান হিন্দুকে কাফের বলিয়া কতই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছে। পৃথিবী দিন দিন কেবল ঘৃণা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মের পরিচ্ছদে সুশোভিত, তাঁহাদের মধ্যেও কত বিবাদ, কত কলহ, কত গঞ্জনা! বড় বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় উঠি-

তেছে। এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকেও পরস্পর কত ঘৃণা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছে। সার্ব্বভৌমিক সত্য, সকল ধর্ম্মেই সমান, অথচ আজ সকল ধর্ম্মই পরস্পর বিরোধী—পরস্পর পরস্পরের শত্রু। ধর্ম্মের বিশ্ববিস্তৃত উদারতার স্থানে কেবলই ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তোমার মতে আমি সায় দেই নাই বলিয়া, তুমি আমাকে ঘৃণা করিতেছ; তুমি আমার মতে সায় দেও না বলিয়া, আমি তোমাকে কত বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছি! তোমার সাধনার প্রণালী আমি অবলম্বন করি না বলিয়া, তুমি আমাকে অধার্ম্মিক ভাবিতেছ; আর তুমি আমার প্রণালী অবলম্বন করিতেছ না বলিয়া, আমি তোমাকে বদ্‌মায়েসের শিরোমণি মনে ভাবিতেছি! এই প্রকারে শাক্ত বৈষ্ণবে, হিন্দু মুসলমানে, খ্রীষ্টিয়ান হিন্দুতে, এবং আরো সূক্ষ্মরূপে হিসাব ধরিলে—শাক্তে শাক্তে, বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে,—হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে, খ্রীষ্টিয়ানে খ্রীষ্টিয়ানে, কত বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। উদার সত্যের স্থান, সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব দখল করিয়া ফেলিতেছে। মানুষ ভাই ভাই কেবলই কাটাকাটী করিয়া মরিতেছে। পৃথিবীর এমনই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে—মানুষ সহজে আর কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে চাহে না—কোন দলে আর মিশিতে চাহে না। কার্লাইয়ের ন্যায় উচ্চ ধার্ম্মিকও বলিতেছেন—"I am no Ist." বাস্তবিক যখন মানব-সমাজ-প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করি, তখন আর কোন দলে মিশিতে ইচ্ছা হয় না। সত্য কথা অবশ্য বলিব, ব্রাহ্মসমাজ সে দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—দশদিন যাইতে না যাইতেই কত বিদ্বেষ—কত ঘৃণা, কত নিন্দা, কত বিদ্বেষের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যমত রক্ষা করিবার জন্য মানুষ মাতিয়াছে, তোমরা বলিতেছ? বাস্তবিক তাহা নহে। আমার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও তোমার সহিত মিলিতে পারি। স্বাতন্ত্র্য যেখানে, মিলনও সেইখানে। স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই মিলন চাই। স্বাতন্ত্র্যও ঈশ্বরের বিধান, মিলনও তাঁহারই বিধান। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিলেই বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা উপস্থিত হয় না। স্বাতন্ত্র্যকে যে মানিয়া চলিতে পারে, সে কি অন্যকে ঘৃণা করিতে পারে? সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, স্বাতন্ত্র্যমত রক্ষা করিয়া চলিলেই, বিদ্বেষ উপস্থিত হয় না। আমি আমি; তুমি, তুমি। আমাকেও মানিব, তোমাকেও মানিব। আমাকেও তোমার প্রয়োজন, তোমাকেও আমার

প্রয়োজন। সৃষ্টির রহস্যই—স্বাতন্ত্র্য ও মিলন। সে কথা না বুঝিয়া, মানুষ বিশ্ব-বিস্তৃত উদারতার স্থানকে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে বড়ই যাতনা উপস্থিত হইতেছে,—মনে হইতেছে, সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে গেলে বুঝি বা রক্ষা পাই। মনে হইতেছে, লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, যোগী ঋষিদিগের ন্যায় বনে গেলে, বুঝি বা ঈশ্বরের স্বাধীনতার পরিষ্কার বায়ু সেবন করিয়া, প্রাণটাকে রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইতেছে—এযে বিষম ভ্রান্তি। সংসারে না থাকিলে শিখিব কোথায়?—পূর্ণময়ের পূর্ণভাব কোথায় পাইব?—কোন এক সীমাবদ্ধ স্থানে ত অনন্ত-তত্ত্ব নাই।—কেবল অরণ্যে যাহা আছে, তাহাই ত কেবল ঈশ্বরের তত্ত্ব নহে;—কেবল বৃক্ষের উপদেশ শুনিলেই ত তাঁহার সকল তত্ত্ব শুনা হইল না। মনে হইতেছে—নরনারীর মুখে তাঁহার যে পবিত্র ছবি চিত্রিত—মানব-হৃদয়ে তাঁহার যে শুভ্র প্রেম প্রতিফলিত, তাঁহাদের সংসর্গে না বসিলে, পূর্ণময়ের সে প্রেম বুঝিব কি প্রকারে? পৃথিবীর সে কোন বস্তু পরিত্যাগ করি না কেন, সে ত বস্তু পরিত্যাগ করা নয়, সে তাঁহারই পূর্ণ তত্ত্বের একটী তত্ত্বকে পরিত্যাগ করা। তাঁহার প্রেরিত কোন্ দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিব? সুখেও শিক্ষা, দুঃখেও শিক্ষা, বিপদেও শিক্ষা, সম্পদেও শিক্ষা। সুতরাং কোনটীকেই অনাদর করিতে পারি না। কোন কিছুই আমি পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। সংসারে থাকিবার জন্য, বিশ্বজননী হস্ত-পদ-বিশিষ্ট এই শরীর-পিঞ্জরে আমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন যখন, তখন এই সংসারেই থাকিতে হইবে, কিন্তু থাকিয়া কি কেবলই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ভাবে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব?—থাকিয়া কি কেবলই ঘৃণা বিদ্বেষের চরণ সেবা করিব? থাকিয়া কি কেবলই অন্যের দোষ স্মরণ করিয়া, আপনাকে, পাপ-অবনতির পূতিগন্ধময় ভীষণ নরকে নিক্ষেপ করিতে থাকিব?—এ প্রশ্নের কে সদুত্তর দিবে? পৃথিবীতে এমন সখা, এমন বন্ধু ত কোথাও দেখি না। সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ উদারতা-শূন্য ভাব হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারে, এমন লোক দেখি না। আমাকে যশ ও নিন্দার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারে, এমন বন্ধু পাই না। আমি কি তবে নরকেই ডুবিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি?—মানব-সন্তান কি দারুণ সঙ্কীর্ণ অসত্যময় দলাদলির কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইবার জন্যই জন্মিয়াছে? প্রাণমন্দিরে নীরবে বিবেক এ

প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন—না। বিবেক বলিতেছেন—সংসারেই অরণ্য আছে, সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলে মানুষ নিশ্চয় রক্ষা পাইবে। সংসারে এমন এক স্থান আছে, যেখানে অন্যের মুখের নিন্দা নাই, প্রশংসা নাই—যেখানে সম্প্রদায় নাই—দল নাই! আপনার হৃদয়-পর্ণ-কুটীর, সেই স্থান। আত্মা সেখানে সংসার-আসক্তি-বিরহিত,—স্বার্থ-সুখ-বিরহিত, নিন্দা-যশ-বিরহিত। মহাযোগীর মহাধ্যান, সেখানে অলক্ষিত ভাবে, অবিরাম হইতেছে। সেখানে একদিকে সংসার—একদিকে অরণ্য! একদিকে সুখ, একদিকে দুঃখ! এক দিকে নিন্দা, একদিকে প্রশংসা! একদিকে আসক্তি, একদিকে বৈরাগ্য, একদিকে প্রেমভক্তি—আর একদিকে জ্ঞানবিশ্বাস! একদিকে প্রকৃতি, একদিকে পুরুষ! একদিকে হর, একদিকে গৌরী। একদিকে স্বার্থ, এক দিকে পরার্থ! সেই নিভৃত প্রাণ-গহ্বরে সকল সমবেত হইয়াছে!—ঘনীভূত মিলন, ঘনীভূত যোগ! মহাদেবের মহাযোগ;—মহামায়ার মহামায়া! কঠোর স্থান বটে, কঠিন হইতেও কঠিন বটে, কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিতে না পারিলে, নিস্তার নাই। কোন এক দিকে টলিলেই বিপদ্। সকলের মধ্য স্থলে আপন আসন রহিয়াছে, সমস্ত সংসারের মধ্য আপন চিহ্নিত বিশেষ স্থান রহিয়াছে, সেই আসনেই বসিতে হইবে। স্বাধীন জীবের, স্বাধীন আসন। কোন দিকে টলিলেই স্বাধীনতা গেল, আসক্তি অধীন করিয়া আপন দিকে টানিল। স্বাধীনতা গেলেই নরক আসিল। এই প্রকার এ দিক, ও দিক ঘুরিয়া, আপন আসন চিনিতে না পারিয়া, কত লোক মরিয়াছে, কত লোক মরিতেছে। কত লোক আজীবন কেবল দাসত্বই করিতেছে! কত লোক কত প্রকারের দাসত্বই করিতেছে। দাসত্ব করিয়া করিয়া পৃথিবী ডুবিতেছে, স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিতেছে—সম্প্রদায় হইয়া যাইতেছে। আপন আসনেই বসিতে হইবে, কিন্তু অন্যের আসনকেও মানিতে হইবে। আমাকেও রাখিব, তোমাকেও মানিব। কিন্তু বড়ই কঠিন কথা। রিপুদিগকে জয় করা সহজ, আকাশ হইতে নক্ষত্রকে অবতরণ করানও অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে, সকল আসক্তিকে বলিদান করিয়া আপন আসনে বসিতে পারা বড়ই কঠিন। সকলের মুখ ভুলিয়া যাওয়া বড়ই কঠিন। জ্ঞানকে প্রেমকে এক চক্ষে দেখা, বড়ই কঠিন। আসক্তিতে ও বৈরাগ্যকে সমান ভাবে আদর করিতে পারা, বড়ই কঠিন। আপন জনকে ও পরজনকে,—শত্রুকে ও মিত্রকে এক চক্ষে

দেখা, বড়ই কঠিন। আর সকল সাধন সহজ, এই মহাসাধনই কঠিন। সকলের বিদ্যা বুদ্ধি, শক্তি জ্ঞান, এখানে পরাস্ত হইয়া যাইতেছে। কঠিন হউক, কিন্তু ঐ মধ্য স্থলে, সকলকে চতুর্দ্দিকে সম দূরে রাখিয়া, না বসিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম আমার চতুর্দ্দিকে; ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এসিয়া, চতুর্দ্দিকে। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান বৌদ্ধ, আমার চতুর্দ্দিকে; আমার আসন মধ্যে। আমি স্বাতন্ত্র্যকে ডুবাইয়া, কোন কিছুরই মধ্যে ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিব না; কোন কিছুকেও মলিনতা সহ আমার মধ্যে পূরিব না। স্বাতন্ত্র্য রাখিব, অথচ সকলের সহিত মিলিব। সকল সম্প্রদায় চূর্ণ হইয়া যাইবে, সকল দল ভাঙ্গিয়া একাকার হইবে। আমার তোমার কি মিলিত করিবার শক্তি আছে?—দল ভাঙ্গিবার শক্তি আছে? ঈশ্বর-কৃপা ভিন্ন শক্তি নাই, ক্ষমতা নাই। তাঁহার কৃপা ভিন্ন অটল হইবার যো নাই। তাই তাঁহাকে কেবলই ডাকিতেছি। মহাযোগে, এই মহা মিলনে অটল হইবার জন্য আমি আর সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছি, —নিরপেক্ষ সাধনের জন্য কেবল তাঁহারই নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার কৃপা পাইলে অবশ্য অটল হইতে পারিব, এই আশা আছে। যাহা হইবার, এই রূপেই হইবে। হই-চই করিয়া কি করিব, আমি কেবল তাঁহাকেই ডাকিব।

# শ্মশান-উক্তি

আমি কে, মানুষ জানিয়াও তাহা জানে না। সংসার—আসক্তি, মহামায়া; আমি—বৈরাগ্য, মহা বিচ্ছেদ। আমরা উভয়ে একত্রে থাকি। একত্র থাকি, কিন্তু এক হিসাবে, আমাতে ও সংসারে আবহমান কাল ঘোর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে? বিবাদে জয়ী কে হইতেছে? অবশেষে কোন্ বীর যুদ্ধে পরাজিত হইতেছে? মানুষ তাহা জানিতে চাহে না, মানুষ তাহা ভাবিতে পারেনা। আমি যে জয়ী, এ কথা মানুষের প্রাণে সয় না। সংসার-মোহাচ্ছন্ন, সুখ-বিলাস-নিমগ্ন মানুষ একবারও ভাবেনা—আমার অধিকারের মধ্যে, আমার বুকের মধ্যে তাহাকে আসিতেই হইবে। সংসার কদিনের;—আজ আছে ত কাল নাই!—ঐ আসক্তি, ঐ মোহ কদিনের? কাল আছে ত পরশ্ব নাই। আমার এ বিশ্ব-বিস্তৃত ক্রোড়কে--এ চির সন্ন্যাসীর

উদার প্রেমের মমতাকে কে জীবন পাইয়া ভুলিতে পারিয়াছে? সংসারকে পরাজয় করিয়া আবহমান কাল আমি মানবকে ক্রোড়ে পূরিয়া রাখিতেছি। এমন লোক পৃথিবীতে নাই, যে অনন্ত কাল আমার ভালবাসাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে। এমন উদার প্রেম, বিশ্ববিস্তৃত প্রেম, পৃথিবীতে আর কোথাও কি পাওয়া যায়?

উদার প্রেমের কথা তুলিলাম ত, আরও কিছু বলিতেছি। সংসারে আসক্তি আছে, কিন্তু উদার প্রেম নাই। সংসার মানুষকে ভালবাসিতে জানে না, কিন্তু বিবিধ প্রলোভনে সজ্জিত হইয়া মানুষকে ভুলাইতে বড়ই দক্ষ! ভুলাইতে এমন দ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। কতই রূপ, কতই শোভা, কতই আকর্ষণ, কতই প্রলোভন, কতই সুখ, কতই আনন্দ,—ঐ সংসারের ভিতরে! মহামায়া কি অপরূপ বেশেই সাজিয়া রহিয়াছে,—রঙ্গময়ী কত রঙ্গই দেখাইতে জানে! এই সকল দেখিয়া মানুষ, প্রজ্বলিত অগ্নিতে যেমন পতঙ্গ প্রবেশ করে, তেমনি করিয়া প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু হায়, এ বিষয়-কারাগারের ভোজ-বাজি সকলকেই প্রতারণা করিতেছে। আকর্ষণে ভুলিয়া, সকলেই সংসার মায়ায় জড়িত হইবার জন্য, স্বাধীনতাকে ডুবাইয়া, দাস-খৎ লিখিয়া দিল, কিন্তু হায়, সকলের ভাগ্যে সমান সুখ জুটিল না কেহ দরিদ্র হইয়া হাহাকার করিল, কেহ ধনী হইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইল। কেহ মূর্খ হইল, কেহ জ্ঞানী হইল। কেহ সুখী হইল, কেহ দুঃখী হইল। সকলের ভাগ্য এক জিনিষ মিলিল না। বড় ছোট, জ্ঞানী মূর্খ, কত ভেদাভেদের সৃষ্টি হইল। মহামায়ার রাজ্যে কতই কলহ বিবাদ, কতই জ্বালা যন্ত্রণা, মানুষের প্রাণে দগ্ধ শলাকা বিদ্ধ করিল। মহা আসক্তি, মোহিনীরূপে ভুলাইয়া, কেমন করিয়া মানুষকে মজাইল! মানুষ অহঙ্কৃত, মানুষ আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া, ভাল মন্দ কিছুই গণনা করিল না। মানুষ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, অন্যকে কষ্ট দিতে একটুও কুণ্ঠিত হইল না। মানুষ অহঙ্কার-দাস হইয়া, অন্যের প্রাণে বজ্র মারিতে, একটুও সঙ্কুচিত হইল না। আসক্তিতে কত আগুন জ্বলিতেছে,—কত অশান্তি, কত অসাম্যের উদয় হইতেছে! প্রেমের মায়ায় মানুষ বিচ্ছেদে পুড়িতেছে, সুধার আকর্ষণে এমনি করিয়া গরল পান করিতেছে। এমনি বিভোর হইয়া রহিয়াছে যে, ভাল মন্দ জ্ঞান নাই। এমনি অচেতন হইয়া রহিয়াছে যে, পরিণাম একটুও ভাবিতেছে না! এমনি হইয়া রহিয়াছে যে—ভিতরের

দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিতেছে না। যাইতে হইবে, তাহাও ভুলিয়া রহিয়াছে। ভুলিয়া রহিয়াছে—ছোট বড়, জ্ঞানী মূর্খ, সকলই! আমার প্রাণে মানব-সমাজের এ দুর্দ্দশা, এ কালিমাময় চিত্র সহ্য হয় না; আমি বৈষম্য দেখিতে পারি না,—আমি মায়ার মোহিনী ভাব সহিতে পারি না; তাই এই দেখ, সহরের একপার্শ্বে, প্রজ্বলিত চিতা সকলকে কোলে করিয়া, পড়িয়া রহিয়াছি; তাই গ্রামের এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছি। লোকেরা ঘৃণা করিতেছে, আমার প্রতি গালিগালাজ বর্ষণ করিতেছে, আমি তবুও আমার কর্ত্তব্য ভুলিতে পারিতেছি না। উদার বিশ্ব-প্রেম বিস্তার করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। আমি তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না। মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাই কত কষ্ট সহ্য করিয়াও, এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছি। আমার নিকট বড় ছোট, ধনী দরিদ্র, পাপী ধার্ম্মিক, সকলই সমান। আমার এ বুক সকলের জন্য জ্বলিতেছে—সকলের কল্যাণ-কামনায় পুড়িতেছে। আমি সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ঘোরতর বৈষম্যের মধ্যে—বৈরাগ্যব্রতধারী হইয়া, ঘোরতর আসক্তির ধারে, মানবের উন্নতির জন্য, কত জ্বালা সহ্য করিয়া বসিয়া রহিয়াছি। মানুষ, দেখত, এমন প্রেমিক আর কে আছে!

কষ্ট সহ্য করিতেছি, যদি বলিলাম, তবে তাহাও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি। আমার কষ্টের কথা কেহ ভাবিবে, এমন বন্ধুও জগতে নাই। আমার সকল কথা দেখ, আমাকেই আজ লজ্জাহীনের ন্যায়, বলিতে হইতেছে। আমার কি অল্প কষ্ট! কি দারুণ প্রজ্বলিত চিতা সকলকে সদাই বুকে করিয়া রহিয়াছি! কি ভয়ানক কঠোর রূপই ধারণ করিয়া রহিয়াছি! অষ্টপ্রহর কেবলই হুতাশন-পীড়ন সহিতেছি! মানুষ কত মধুর ভাষায় সংসারের রূপ বর্ণনা করে, আমার কঠোর রূপ একবারও কেহ ব্যাখ্যা করে না। আমার প্রাণে কত সয়? আবালবৃদ্ধ, জ্ঞানীমূর্খ, সকলে কেবলই আমার নিন্দা প্রচার করিতেছে! লোকে বলে—আমি প্রেত-ভূমি, পিশাচ-বৃন্দের নৃত্যভূমি—আমি নরক, আমি অতি ঘৃণিত। লোকে বলে,—সোণার মানুষের যত্ন-সঞ্চিত অমূল্য রত্ন সকলের আভরণ, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি অপহরণ করিতেছি,—আমি দস্যু! সে কথা মিথ্যা নহে। দেখ, আমি, প্রেম-পুত্তলি শিশুকে মাতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতেছি, সতীকে পতি-শোকে অধীরা করিতেছি, রাজসিংহাসনকে শূন্য করিয়া

রাজাকে আনিতেছি;—কত অশ্রুপতনের কারণ হইতেছি, আমার ন্যায় পাপী, জঘন্য এ জগতে কে আছে? কত স্মৃতিময়ী রূপকে মিলাইয়া দিতেছি, কত কত গৌরবময়ী কান্তিকে অপহরণ করিতেছি—কত সুখময়ী আলিঙ্গনের সাধকে নিমিষের মধ্যে নির্ম্মূল করিয়া দিতেছি, আমার ন্যায় পাষাণ-হৃদয় আর কে আছে! কত অস্থি, কত পঞ্জর, কত মেদ, কত মাংস, কত শোণিত, কত তেজ, কত রূপ, কত বীর্য্য, কত অহঙ্কার—কত আসক্তিকে আমি চিরকালের জন্য আঁধারে মগ্ন করিতেছি! আমার ন্যায় অসুর, আর কে আছে? এমনি করিয়া সংসার-সেবকেরা আমাকে কত গালাগালিই করিতেছে। আমার প্রাণে আর কত সয়? আমার সমদুঃখী বন্ধু এই পৃথিবীতে একটীও নাই—আমার কষ্ট কে বুঝিবে?—দুঃখের কথাই বা কে ভাবিতে পারে?—চির-উলঙ্গ—চির অনাসক্ত—ভস্মাবৃত বৈরাগী, —দয়া-মায়াহীন—পাষণ্ড—কঠোর—অশ্রুবিরহিত,—কেবলই শোণিত-পিপাসা প্রাণের মধ্যে জ্বলিতেছে, আমার কষ্ট কে বুঝিবে? কত তিরস্কার, কত গালিগালাজ সহিয়াও আমি অবিরাম, অবিশ্রান্ত, আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি! আমার কর্ত্তব্য পালনে কিছুতেই বিমুখ হইতেছি না। মানুষ কি কখনও আমার কষ্ট বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে? যদি চেষ্টা করিত, তবে আমার নিকট এই শিক্ষা পাইত—কোন কিছুর আকর্ষণেই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে।

আমি অবিরত কর্ত্তব্য পালনে রত আছি। সুখ-বিলাস-পূর্ণ সংসারও যাঁহার ইঙ্গিতে সৃষ্ট, এই ভস্মাবৃত আমিও তাঁহারই আদেশে সৃষ্ট! মায়ের আদেশ আমাকে পালন করিতেই হইবে! মায়ের সন্তান মাকে ভুলিয়া চিরকাল সংসার-আসক্তিতে মজিবে, ইহা আমার প্রাণের অসহ্য। আমি যাহা পারি না, তাহা কখনই পারিব না। মানুষ পরিণাম ভুলিয়া থাকিবে, ইহা আমি দেখিতে পারিব না। মানুষ কেবলই দাসত্ব করিবে—অর্থের দাসত্ব, কাম ক্রোধ লোভের দাসত্ব, অহঙ্কারের দাসত্ব, স্ত্রীর দাসত্ব, স্নেহময় পুত্রের দাসত্ব, দর্পময় রাজার দাসত্ব, বিস্মৃতিময় আসক্তির দাসত্ব,—সুখময় বসন ভূষণের দাসত্ব,—রূপের দাসত্ব, ইহার কিছুই আমি দেখিতে পারি না। শিক্ষার জন্য, পরিণাম পথে অগ্রসর করিবার জন্য, এই ধন-ধান্য-পরিপূর্ণ সংসারে তিনি মানুষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু উন্নতিকে ভুলিয়া পরিণামকে ভুলিয়া, মানুষ অসার খেলা লইয়া মত্ত থাকিবে, ইহা কে

সহিতে পারে? এই জন্য তিনি আমাকে দূতস্বরূপ, সংসারের এককোণে রাখিয়াছেন! তাঁহারই আদেশ পালন আমার কার্য্য! আমি, মানুষের আসক্তিকে নির্ব্বাণ করিয়া, মানুষকে যে অমৃত ধামে পাঠাইতেছি, মানুষ তাহার তত্ত্ব না বুঝিয়া, আমাকে চিরকাল কেবলই গালিগালাজ বর্ষণ করিয়া আসিতেছে। দাসত্ব-নরক হইতে মুক্ত করিয়া, মানুষকে, স্বর্গের সনাতনী তন্তু দ্বারা ভূষিত করিয়া, এক অপরূপ রাজ্যে প্রেরণ করিতেছি। এমন রাজ্যে পাঠাইতেছি, যেখানে মিলন আছে, বিচ্ছেদ নাই; শান্তি আছে, অশান্তি নাই; সুখ আছে, দুঃখ নাই; আনন্দ আছে, নিরানন্দ নাই; পুণ্য আছে, পাপ নাই; ন্যায় আছে, অন্যায় নাই। এ সকল কথা লোকে বিশ্বাস করে না, লোকে বিশ্বাস করিতে চায় না। এমনই অহঙ্কার-স্ফীত মানুষের প্রাণ! না বিশ্বাস করুক,—আমাকে ভুলুক ত দেখি? যদি এতই গালিগালাজ বর্ষণ করিল, তবে একবার আমাকে পরাজয় করুক ত দেখি? মানুষের বুকে কত শক্তি, হৃদয়ে কত রক্ত, কত অহঙ্কার, একবার বুঝিব! আমার বিজয়ভেরী—চির-নিনাদিত। কে আমাকে পরাস্ত করিবে? আমি, অপরাজিত দর্প সহকারে, চির দিন বিজয়ভেরী বাজাইয়া আসিয়াছি। কাহাকেও ডরাইব না। আমার ভীষণ দণ্ড প্রহারে সকলের প্রতাপকে চূর্ণ করিব। মানুষ, তুমি মনে করিতেছ, তুমি আপনিই সকল করিতে পার? করত একবার? এই মহাবৈরাগ্যের দারুণ কষাঘাত হইতে একবার আপনাকে রক্ষা করত দেখি? সে সাধ্য কাহারও নাই! তবে কেন বৃথা আস্ফালন করিতেছ?—কি বা জান, কিবা বুঝ?—কিবা শক্তি, কিবা বিদ্যা?—আমি ওসকল কিছুকেই ভয় করি না। আমি সকলকে পরাজয় করিয়া, ভস্মে মিশাইব। সকল একাকার করিব। জাতিভেদ, সোণার মানুষের উদারতাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে? আমি থাকিতে কথনই তাহা হইবে না; আমি সব একাকার করিব! তুমি রাজাই হও, আর তুমি সম্রাটই হও, তোমাকে ঐ রাস্তার মুটে মজুরের সহিত আমি একত্রে মিলাইব! বিশ্বজননীর উদারতাকে ও সাম্যকে পদ-দলন করিয়া, এতই দর্প প্রকাশ করিতেছ? আমি সকল দর্প চূর্ণ করিব! করিবই করিব! আমি আপন পর ভুলাইব! শত্রু মিত্র এক করিব! অসাম্য, সঙ্কীর্ণতা ও অহঙ্কারকে আমি চূর্ণ করিব? হয় আজ—নয় কাল! এই যে বৈরাগী—চিরসন্ন্যাসী—ভস্মাবৃত চিরযোগী—

এ যোগীকে সামান্য ভাবিয়া আজ বক্ষস্ফীত করিয়া চলিয়া যাইতেছ, পথিক, একদিন তোমাকে ধরিবই ধরিব। আমার এ বিশ্ব-বিস্তৃত কোলে কে স্থান পায় নাই? আমার নিকট সকলই সমান, সকলকেই কোল দিব। ঘৃণা বিদ্বেষকে একত্রে পোড়াইব! রাজাকে প্রজাকে, ধনীকে দরিদ্রকে, জ্ঞানীকে মূর্খকে, একত্রে মিশাইব! সকলকে মিশাইয়া, আশার কথা শুনাইব, সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিব, একতা-সূত্রে সকলকে বাঁধিব, পরে প্রেমময়ী বিশ্ব-জননীর নিকট পাঠাইব!

জননীর ক্রোড়ে পাঠাইব! মানুষ আমাকে ভয় করিও না। আশার কথা শুন;—এই বৈরাগ্যে আসক্তি আছে,—এই নিরানন্দে চির আনন্দ প্রবাহ বহিতেছে! আমাতেই সুখ, আমাতেই শান্তি, আমাতেই আনন্দ, শুধু আমাতেই মঙ্গল। সংসারে সুখ আছে, দুঃখও আছে; এক আছে ত তাহার বিপরীতও আছে। কিন্তু আমার ভিতরে তাহা নাই। আমার ভিতরে এক জিনিস আছে—সদানন্দ। ইহার মর্ম্ম, অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছে। এক দিন এ নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, প্রেম-বিরাগী মহাদেব। তাই তিনি সকল আসক্তি ডুবাইয়া, জীবন্মুক্ত হইয়া—আমার বুকে বসিয়া, একদিন যোগসাধন করিয়াছিলেন। মহাযোগীর মহাযোগ! চির-উদাসী, চির-উলঙ্গ, চির-বৈরাগী মহাযোগে যোগী হইলেন, মহা আসক্তিতে নিমগ্ন হইলেন! সংসারের আসক্তি কি আসক্তি?—আসক্তি প্রকৃত পক্ষে আমারই ভিতরে, সংসারের সমস্ত শিক্ষা আমারই ভিতরে। মাতৃ-আসক্তি আমারই ভিতরে, মাতৃপ্রেম আমারই বুকের মধ্যে। সংসারে এ সকলের আভাস মাত্র আছে, কিন্তু তাহাও কণ্টক-শূন্য নহে! কণ্টক-শূন্য প্রেমাভাস শুধু আমার বুকের ভিতর! মানুষ আমাতে ডুবিলেই, প্রকৃত সুখ পায়! মানুষ-আমার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেই, বিশ্বজননীকে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করিতে পারে। ইন্দ্রিয় থাকিতে সে যোগ, সে মিলন, অসম্ভব। কিন্তু এ বিধানও তাঁহার, ও বিধানও তাঁহার। আপনার উপরে নির্ভর না করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাক, তিনি যাহা করিবেন, তাহাতেই মঙ্গল হইবে। সংসারকে ভুলিয়া কেবল আমার পানে চাহিও না, অথবা আমাকে ভুলিয়া কেবলই সংসারে মজিও না। সংসারের বুকেই আমি বর্ত্তমান; আমার বুকেই সংসার বর্ত্তমান। জীবন পাইলেই মৃত্যু। মৃত্যু আছে বলিয়াই, মানুষ, জীবন ধারণ করিতেছে। সংসার পথে হাটিতে, হাটিতে, যখনই ক্লান্তি, অব-

সন্নতা, মোহ আসিয়া মানুষকে ধরিতেছে, তখনই আমি আমার কোল প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতেছি। সংসার-মরুতে আমিই একমাত্র শান্তি-সলিল-প্রবাহ। এ দগ্ধ বুকে, কেবলই শান্তি-প্রস্রবণ প্রবাহিত। আমি সংসারের পার্শ্বে, দুর্জ্জয় পরাক্রমে, বিরাজ করিতেছি বলিয়াই, মানুষ সংসার-মরুতে থাকিতে সমর্থ হইয়াছে, নচেৎ কেহই সংসারে থাকিত না। চিরকাল কেহই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিত না। অনন্ত-কাল কেহই অসার শরীরের দাসত্ব করিত না। অনন্ত-কাল কেহই জীবনের দুঃখ, কষ্ট সহিত না। আমি আছি, তাই মানুষ আশাকে বুকে বাঁধিয়া, দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করিয়া, অগ্রসর হইতেছে। শ্মশান না থাকিলে, মনুষ্য, জীবন রাখিত না। বিশ্বমাতার সন্তানকে, সংসারও পালন করিতেছে, আমিও ধরিতেছি! কেবল সংসার নহে, কেবল আমিও নহি। এ দুই চাই, এ দুইকেই রাখিবে। বৃথা অহঙ্কারী হইও না। সংসার-আসক্তিতে মজিয়া আমার বিজয়ভেরীর কথা ভুলিয়া থাকিও না। সুখ কামনা করিবে ত, দুঃখকেও ভাবিবে! মিলনকে ভাবিবে ত, বিচ্ছেদকেও বুঝিবে! সংসার ও আমি এক প্রেমে প্রেমিক, এক যোগে যোগী। আমরা দুই ভাই ভগ্নী! সংসার—স্নেহময়ী, রূপময়ী, কেবলই মানুষকে লালন পালন করিতেছে, কত বেশ ভূষায় সাজাইয়া তুলিতেছে; আর আমি কঠোর অসুরের ন্যায়, মানুষের সে সকল আভরণ কাড়িয়া লইয়া এক অপরূপ, অদৃশ্য, অদৃষ্ট রাজ্যে প্রেরণ করিতেছি। মানবের উপর আমাদের দুই জনের সমান অধিকার। আমাকেও মনে রাখিবে, আমার ভগ্নীকেও মান্য করিবে। সংসারকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই, বিশ্ব-জননী আমাকে রচনা করিয়াছেন; নচেৎ আমি এই ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া, এমনি করিয়া বসিয়া থাকিতাম না। সংসারের ভিতরেও যিনি, আমার ভিতরেও তিনি। এক জিনিস, দুই ভাবের মধ্যে, দুই রূপে বর্ত্তমান! মানুষ তোমরা কিছুই জান না ত, কেবল বৃথা হই-চই করিতেছ কেন? ভাব-সাগরে নিমগ্ন হও! সংসার-সাধনে জয়ী হইয়া, শ্মশান-সাধনের জন্য প্রস্তুত হও। আসক্তি ছাড়িয়া বৈরাগ্যে দীক্ষিত হও। চিদ্‌ঘন আনন্দরূপ-সাগরে চির নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত হও। বৃথা আসক্তি লইয়া, হিংসা বিদ্বেষের সেবা করিলে কিছুই হইবে না। রূপ এখানে, রূপ ওখানে। দুই ভাই ভগ্নীর মধ্যে দুই রূপ দেখ। একরূপ দেখিতে যাইয়া, আর এক রূপকে ভুলিয়া অহঙ্কারী হইও না। সংসারের পার্শ্বে—জীর্ণ শীর্ণ, মলিন বেশে আমিও

রহিয়াছি, সর্ব্বদাই মনে রাখিবে! মাতার আদেশে আমার প্রজ্বলিত চিতার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সকল আসক্তিকে নির্ব্বাণ না করিলে, নূতন বেশ ধারণ করিতে পারিবে না, সর্ব্বদাই মনে রাখিবে! জন্মিয়াছ যখন, তখন আমার কোলে শরীর-রত্নকে ভাসাইয়া দিতেই হইবে। যে পরলোকের জন্য তোমরা লালায়িত, আমার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কখনই সেখানে যাইতে পারিবে না। পরলোকের জন্য তোমরা লালায়িত, আমি তাহা বেশ জানি; নচেৎ হাসিয়া হাসিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া, উড়িয়া উড়িয়া, নাচিয়া নাচিয়া, পতঙ্গের ন্যায় তোমরা কখনই আমার ভীষণ দগ্ধ বুককে আলিঙ্গন করিতে পারিতে না। আশা না থাকিলে, কে মরিতে পারে?—পরলোকের কথা তোমরা পাপ-মুখে বল আর না বল, উহা তোমাদের প্রাণের গভীর মর্ম্ম কথা। আমি তাহা জানি। পরলোকের যাত্রীদল, ঐ দেখ, ক্রমাগত আমারই দিকে ছুটিতেছে। জন্ম গ্রহণ করিয়া, মানুষ অবিরত ছুটিতেছে,—আমারই দিকে। লক্ষ্য এক, গতি এক। পরলোককে লক্ষ্য করিয়া মানুষ ছুটিয়া আসিয়া আমার ভিতরে মাথা রাখিতেছে। যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিতেছে, সকলই আমার বুকের ভিতরে ঢালিয়া দিয়া যাইতেছে! রূপ তেজ, শক্তি বল, সকলই ভাসাইয়া দিতেছে! ভালবাসা, আসক্তিময় শরীর—অম্লানচিত্তে আমাকে উপহার দিতেছে! সে উপহার লইয়া আমি মাতিতেছি,—জ্বলিতেছি,—হু হু শব্দে আকাশকে কাঁপাইয়া তুলিতেছি। সে কম্পনে আকাশ হইতে দৈববাণী আসিয়া যাত্রীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এমনই অলক্ষিত ভাবে লইয়া যাইতেছে, মানুষ তাহা দেখিতে পাইতেছে না। মানুষ দেখিতে পাইতেছে না, তবুও ছুটিতেছে;—কোথায় গেল, কোথায় গেল, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া আমারই ভিতরে সকলে প্রবেশ করিতেছে। আমারই ভিতরে, পরকাল। আমারই ভিতরে, শান্তির নিকেতন;—আমারই ভিতরে আনন্দময়ীর আনন্দ-মন্দির! মানুষ, ভয় নাই, তবে আয়! পরলোকের যাত্রীদল, ছুটিয়া ছুটিয়া আয়! অহং-জ্ঞানকে ভাসাইয়া, সংসার-আসক্তিকে নিবাইয়া, এই যজ্ঞে জীবনাহুতি দিয়া, পরলোকে যাবি ত, আয়!—আমি পথ-ভোলা বালককে মায়ের মুখ দেখাইব, মানুষ, সরল প্রাণে, নির্ভয় অন্তরে, আয়। ভোলানাথের ন্যায় পাগল হইয়া আয়, আমি সকলকে যোগী সাজাইয়া দিব। নব আশা-ভূষণে সাজিবি ত সকলে চ'লে আয়।